আমরা ও তাঁহারা

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দেড় টাকা

মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুরী লেন, কলিকাতা
শ্রীঅম্বিকাচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।
গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, ১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পিতৃদেবের
স্মরণে

সূচী

মুখবন্ধ—

প্রথম স্তবক—

বিরোধের কথা ... ... পৃষ্ঠা ১

দ্বিতীয় স্তবক—

সুরের কথা ... ... „ ১৭

তৃতীয় স্তবক—

সঙ্গীতের কথা ... ... „ ৩৪

চতুর্থ স্তবক—

মনের কথা ... ... „ ৬০

পঞ্চম স্তবক—

দেশের কথা ... ... „ ৮০

ষষ্ঠ স্তবক—

স্ত্রী-পুরুষের কথা ... ... „ ১১৭

মুখবন্ধ

বইখানির প্রথম তিনটি স্তবক বছর কয়েক পূর্ব্বে মাসিক 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়, বাকী তিনটি নতুন লেখা। কেবল আত্মতৃপ্তি ছাড়া রচনাগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার অন্য কৈফিয়ৎ আছে। আমাদের সমাজে আমূল পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। প্রবাসী-সমাজের বন্ধন স্বভাবত একটু শিথিল হয় বোলেই প্রবাসে লক্ষণগুলি বেশী পরিস্ফুট হ'য়েছে। জন্মগত দায়িত্ব ও অধিকার, জাতিগত বৃত্তি, ও সামাজিক ধর্ম্ম—এই তিন প্রকার সংস্কারের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ আজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। ইংরাজী সভ্যতা ও শিক্ষাই এই পরিবর্ত্তন ও গঠনের অন্যতম প্রধান কারণ। সেইজন্য বর্ত্তমান সমাজে ইংরাজী শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বিভাগ প্রথমেই চোখে পড়ে। উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায়, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারীরা নতুন সমাজের ব্রাহ্মণ হ'য়েছেন। যাঁরা ইংরাজী ভাষা জানেন না, ইংরাজী সভ্যতাকে জীবনের নিত্যকর্ম্মে গ্রহণ কিংবা ব্যবহার করেন নি, তাঁরা, ব্রাহ্মণেতর জাতির মতনই, নতুন আদর্শের সুখশান্তি, উন্নতি, আশাভরসা থেকে বঞ্চিত র'য়েছেন। নব্য-ব্রাহ্মণের দল বিদেশী রাজার অনুচর ও গুপ্তচর। তাঁরা বিজাতীয় সভ্যতার পৌরোহিত্য ক'রে অর্থ ও সাংসারিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রেছেন। তাঁদেরকে বুদ্ধিজীবি বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পরশ্রমজীবি—কি বিদ্যার, কি অর্থের, কি প্রতিষ্ঠার। এত দিন অশিক্ষিতের সামাজিক স্থান নির্ভর করত

কৃষিকার্য্য ও ব্যবসার ওপর। কিন্তু কৃষিকার্য্য ও গ্রাম্যশিল্পে কোন মুনাফা নেই, সম্মান নেই, তাই বৈশ্য ও শূদ্রেরা নব্যব্রাহ্মণের অনুকরণে মধ্যবিত্তের পংক্তিতে উঠ্‌তে ব্যগ্র। একধারে আত্মরক্ষা ও অন্যধারে প্রসারশীলতার ঘাত-প্রতিঘাতে বিরোধের সৃষ্টি হ'য়েছে। পূর্ব্বকালের বিরোধ সমাজ-ধর্ম্মের দ্বারা আবৃত ছিল। সে আবরণের অভাবে বিরোধের স্বরূপ এখন প্রকট হচ্ছে; নতুন শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কারের দ্বারা রচিত শ্রেণীগুলি নিতান্তই স্বার্থমূলক হ'য়ে প'ড়ছে। যখন উচ্চশিক্ষিতের দায়িত্বজ্ঞান লোপ পায়, অথচ শীর্ষস্থানে স্থায়ীভাবে নেতৃত্ব করবার দাবীদাওয়া বেড়েই চলে, যখন তাঁরা স্বার্থের গণ্ডীকেই সমাজের সমগ্রতা ব'লে ভুল করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁদের স্বাভাবিক নেতৃত্বের দাবী স্বীকার করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। কার্ল মার্ক্‌সের প্রত্যেক বাক্য বেদবাক্য না মেনেও সত্যের খাতিরে মানতে হয় যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বর্ত্তমান সমাজের মেরুদণ্ড কিংবা উত্তমাঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। ইংরাজ-রাজা অবশ্য তাঁদেরকেই দেশের নেতা ভাবছেন—তাই ভাবাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যা স্বাভাবিক তাই সত্য নয়। সকলেরই মনে সন্দেহ উঠেছে যে, একটি শ্রেণীর স্বার্থ সমাজের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে। আমাদের দেশে যে ভাবে আন্দোলন চলেছে তাতে মনে হয় যে মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় সামাজিক উন্নতির পথে অন্তরায় হ'য়েছেন। অথচ শিক্ষা চাই, অবসর চাই, ভদ্রতা চাই। সমস্যা যদি এই হয়, তা হ'লে কর্ত্তব্য হচ্ছে, দূরকে নিকট ক'রে, পৃথককে যোগসূত্রে বেঁধে, বিরোধকে সৃষ্টির কাজে এনে নতুন সমাজ

গড়ে তোলা। একটি উপায় শিক্ষা, তবে সে শিক্ষার মানে সাহিত্যের অনার্স নয়। সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচারে, এবং শিক্ষিতের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রসারের দ্বারা বিরোধের আংশিক অবসান হবে আশা করি। কারণ, সৃষ্টির প্রধান কথা জ্ঞান, ভাবের আবেগ নয়; এবং সে জ্ঞান যত ইহজগতের হয় ততই ইহজগতের মঙ্গল। বিজ্ঞানই ইহজগতের জ্ঞানের মধ্যে একমাত্র পদ্ধতি যাকে বিশ্বাস ও নির্ভর করা যায়। বিস্তর দোষ থাকা সত্বেও, এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই সাহায্যে কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা দূর হয়, অন্যায়ের বোঝা কমে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় ও বহুদূর পর্য্যন্ত চলে। বিরোধের সম্পূর্ণ অবসান বাঞ্ছনীয় কি না জানি না, সম্ভব কি না জানি না, যদি বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব হয়, তা হ'লে হয়ত অন্য উপায় আছে। কিন্তু সে উপায় উদ্ভাবন করা আমার ধর্ম্ম নয়।

'আমরা ও তাঁহারা'তে একদিকের বক্তা আমি, অন্যদিকের বক্তা তাঁহারা। নিজের মধ্যে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতের দোষগুলি লক্ষ্য ক'রেছি ব'লেই একবচন ব্যবহার করেছি। সাধারণের বেলা আমার সে স্বাধীনতা নেই। বিরোধের প্রকৃত মূর্ত্তিটি প্রকট করবার জন্য দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতীক্ নিলেই ভাল হ'ত। কিন্তু সে ধরণের বৈপরীত্য একেবারেই অস্বাভাবিক। উচ্চশিক্ষিত এবং মূর্খের সঙ্গে কোন প্রকার কথোপকথন কি ভাবের বিনিময় সম্ভব নয়। সেইজন্য শিক্ষাভিমানী বুদ্ধিজীবিকে এবং সহরের অন্যশ্রেণীর বন্ধুদেরকে প্রতীক হিসেবে নিতে হ'য়েছে। শ্লেষ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে দুই শ্রেণীরই দোষগুণের ইঙ্গিত করেছি। আমার নিজের বক্তব্য এই যে, শিক্ষার মূল্য চিরন্তন হ'লেও উচ্চশিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্ত

সম্প্রদায়ভুক্ত বুদ্ধিজীবির স্থান এই পরিবর্ত্তনশীল ভারতের সমাজে আর নেই। ভবিষ্যতে সে স্থান যে আরো সঙ্কীর্ণ হবে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষা যখন স্বার্থে পরিণত হয়, তখন আত্মরক্ষার জন্য বিদ্যার অভিমান, দম্ভ ও অভিনয়ের প্রয়োজন হয়। পৌরুষের অন্য প্রকাশ আমাদের পক্ষে যে অসম্ভব!

আমার বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি গোটাকয়েক সাধারণ বিষয়ের প্রতি আমাদের ও তাঁহাদের মনোভাবের সাহায্যে। বিষয়গুলির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। আর্ট, বিজ্ঞান, স্বদেশ ও সামাজিক জীবন সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। আর্টের মধ্যে সঙ্গীত, এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটি বেছে নিয়েছি। সঙ্গীত-প্রীতি, দেশাত্মবোধ এবং প্রেম সাধারণের সম্পত্তি হ'লেও শ্রেণী অনুসারে প্রত্যেক মনোভাবের তারতম্য আছে। অর্থ উপার্জ্জনের ভিতর দিয়ে সামাজিক দ্বন্দ্ব যতটুকু প্রকাশিত হচ্ছে তার পরিচয় অন্যত্র পাওয়া যাবে। যখন মানসিক দ্বন্দ্ব অর্থোপার্জ্জনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে, তখনই আমরা শ্রেণীগত পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হব।

যদি তর্ক-বিতর্কে সর্ব্বসাধারণের, অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতি অন্যায় ক'রে থাকি তা হ'লে তাঁহাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব বেশী, সহানুভূতি খুব গভীর, কখনোই হ'তে পারে না—এইটাই দুঃখ। ভাষাও সেই জন্য হয়ত সহজ হয়নি। অধ্যাপকদের ভাষা দুর্ব্বোধ্য ও ইংরেজী-বহুল হ'তে বাধ্য। যে ভাষায় আমরা কথোপকথন ও বক্তৃতা করি, সেটি আমাদেরই আবিষ্কৃত ইংরাজী ভাষার অনুবাদ। অতএব বইখানিকে সামাজিক পরিবর্ত্তনের ও শ্রেণীগত বিরোধের

চিহ্ন স্বরূপ বিবেচনা ক'রলেই আমার উদ্দেশ্য খানিকটা সফল হবে। বইখানির মধ্যে অন্যান্য দার্শনিক ও সাহিত্যিক গলদ, আশা করি, সমালোচকরা দেখিয়ে দেবেন। তাঁদের কাছে একটি মাত্র অনুরোধ যে আমার মুখ দিয়ে ব্যক্ত মতামতগুলি ঠিক আমার নয়, আমার দলের, এই কথাটি যেন তাঁরা স্মরণ রাখেন।

আমার শেষ ও প্রধান বক্তব্য এই যে বইখানির মূল্য আমার নিজের কাছে খুব বেশী হ'লেও বন্ধুদের কাছে মাত্র দেড় টাকা। আমার বন্ধুরা ছাড়া অন্যে আমার লেখা পড়েন না, কারণ উপকৃত হবার প্রবৃত্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই কম। আমার বন্ধুরা, প্রত্যেকেই, এক এক কাপি উপহার প্রত্যাশা করেন, এবং আমার কর্ত্তব্যও প্রত্যেককে উপহার দেওয়া। কিন্তু ঠিকুজী ও বর্ষপ্রবেশ, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের কিংবা কর্ত্তাদের চা-পার্টির জন্য তাঁদেরকে বিস্তর টাকা খরচ ক'রতে দেখেছি, তাই থেকে মাত্র দেড় টাকা বাঁচিয়ে আমার বইখানা কিনে—না পড়লেও আমি কৃতজ্ঞ হব। না প'ড়ে বিরুদ্ধ সমালোচনার ত্রুটি দেখে এবং ঋণের মাত্রা কমছে দেখে যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় অন্তত সেটুকু আমার প্রাপ্য। আশা করি, বন্ধুরা ওটুকু আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পয়লা জুলাই, ১৯৩১
কলিকাতা।

আমরা ও তাঁহারা

প্রথম স্তবক—বিরোধের কথা

সহর ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বাংলোতে আসার জন্য বড় বদনাম হয়েছে শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কি করি? ধূলার মধ্যে থেকে শরীর অত্যন্ত খারাপ হতে লাগ্‌ল, এবং একই গণ্ডীর মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোরলে চিন্তার ধারাগুলিও অভ্যাসে পরিণত হবে ভেবে সহর ছাড়তে বাধ্য হলাম। এধারে বয়সও বেড়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রাতিকূল্যে জীবন-যাত্রা চালাবার লোভ ও ক্ষমতা কমে আসছে। তাই নিরালায় নীড় বাঁধতে চলে এলাম। আমার নতুন বাড়ী সহর থেকে অনেক দূরে, নদী পার হয়ে আসতে হয়। সহরের খবর তিন-চারদিন পরে কলিকাতার খবরের কাগজ মারফৎ পাই। অবশ্য সে জন্য আর আমি দুঃখিত হই না, নেহাৎ আধুনিক হবার মোহটা ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। এ নির্জ্জন স্থানে আরো দু'চার বছর থাকলে আমি পুরোপুরি অধ্যাপক হয়ে যাবো। সাধনার পক্ষে বর্ত্তমানের সংসর্গ ও কোলাহল অত্যন্ত ক্ষতিকর, বিশেষতঃ যখন ব্রত আমার অধ্যাপনা। ছাত্রদের কিছু বর্ত্তমান কিংবা ভবিষ্যতের সম্বাদ দিতে পারি না, কেননা সে সম্বাদের কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। মূল্য আছে এক অতীতের, কারণ অতীত চিরস্থায়ী, এবং যে জিনিষের স্থায়িত্ব নেই, তার আইন-কানুনও নেই। আর আইন-কানুন ছাড়া অন্য কিছু পড়ান যায় না। অন্য ধরণের শিক্ষা দিলে ছাত্রদের ঔচিত্যানৌচিত্য জ্ঞান বাড়ান যায় না। বর্ত্তমানে কি হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতে কি হবে বোলতে গেলেই

পৃথিবীতে যা হয়েছে কিম্বা যা হচ্ছে তাই ঠিক হচ্ছে, এ কথা ছাত্রেরা আর বিশ্বাস কোরবে না। এ রকম বিশ্বাস হারালেই ছেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে, নিজের মতে কায কোরতে শিখবে—চাকরী পাবে না, এবং আমার চাকরী যাবে। অতএব অতীতের জয় হোক্! বর্ত্তমান জাহান্নমে যাক্! এবং আমি সহর ছেড়ে নদী পার হয়ে এসে জীবনের বদলে উপজীবিকার সাধনা করি!

কাল রাত্রি নয়টার সময় আরাম কেদারায় শুয়ে সহুরে বন্ধুদের কথা স্মরণ করছিলাম। দেহটা ক্লান্ত হ'লে মানুষ বড় ভাবপ্রবণ হয়ে যায়। অত্যন্ত ক্লান্ত হ'লে অবশ্য বিদ্বেষ আসে, কিন্তু মাষ্টারের ক্লান্তি কিছু মুটে-মজুরদের মতন হয় না। অত্যধিক ক্লান্তিতে কলের মুটে-মজুররা হাত পা কেটে ফেলে, কিম্বা মদ খায়। এই স্বল্প ক্লান্তিতেই কিন্তু মানুষ অনেক বোকামি করে ফেলে। প্রেমপত্র লেখা এই কর্ম্ম অন্তে, বিরাম সাগরে নিমজ্জিত হবার সময়েই সম্ভব হয়। হাতে একখানা বই ছিল, কিন্তু মন ছিল সহরে, বইএর বাইরে। সহরে থাকতে সহরের বন্ধুরা কেমন অযাচিত ভাবেই আসতেন, গল্প কোরতেন, অনেক রাত্রে হাসতে হাসতে চলে যেতেন। এখন আর কেউ আসেন না। মনটা কেমন বিষাদে ভরে উঠ্‌ল। একটু চুপ কোরে শুয়ে রইলাম। কি আশ্চর্য্য! কিছুক্ষণ পরেই দেখি আমার সহরের বন্ধুরা এসে উপস্থিত। আমি ত হতভম্ব! তাঁদের সমাদর কোরতেই ভুলে গেলাম। তাঁরা নিজেরাই আসন টেনে নিয়ে বোসে পড়লেন। তারপর কথাবার্ত্তা চল্‌ল।

আমি—এইমাত্র ভাবছিলাম যে কাল ছুটী, সকালেই আপনাদের সঙ্গে দেখা কোরতে যাবো। আপনারা যে দয়া

কোরে উপস্থিত হয়েছেন সে জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে।

তাঁহারা—জ্যোৎস্না কেরাণীদের জন্য নয়। চাঁদের কিরণ, মলয় প্রভৃতি কাব্যবস্তু আপনাদেরই উপভোগ করা শোভা পায়। কায কোরতে হয় না, বোসে বোসে মাইনে নিচ্ছেন—মোটা মাইনে, বছরে সাত মাস ছুটী। কাল রবিবার, অনেক সংসারের কাজ কোরতে হবে—তাই আজ অসময়ে উদয় হলাম। সেজন্য আপনি ইংরাজী কায়দা হিসাবে ধন্যবাদ দেবেন না—বরং আমাদেরই আপনার কাছে মাফ চাওয়া উচিত। ওসব ইংরাজী কায়দা এ পাড়ার ভদ্রমহোদয়দের জন্যই তুলে রাখুন। আমাদের জন্য একটু আন্তরিকতা থাকলেই আমরা কৃতার্থ হব। নতুন পাড়ায় এসে শরীরের কোন উন্নতি হচ্ছে বলে মনে লাগ্‌ছেনা ত; এ পাড়ায় গানের চর্চ্চা হয় না ?

আমি—আজ্ঞে না, গান একেবারে ভুলে গেছি, গান শুনতেও পাই না, গাইতেও চাই না। কতদিন গান শুনিনি, গান গাইনি ভাবলেও কষ্ট হয়। আমি বোধ হয় বেশী দিন ভাল গান না শুনলে বাঁচতেই পারি না। এক এক সময় মনে হয় যে, এ পাড়ায় এসে বোধ হয় ভাল করিনি—শরীরের দিক্ দিয়ে কোন লাভ হল না—

তাঁহারা—মনের দিক্ দিয়ে কিছু হয়েছে কি ?

আমি—সেখানে লাভালাভের হিসাব এখনও খতিয়ে দেখিনি।

তাঁহারা—আপনারাও যদি হিসাব করেন তা হ'লে আমরা কি করব ?

আমি—কি জানেন, অধ্যাপকের কায হিসাব করা ছাড়া আর কিছুই না। আপনারা করেন অঙ্কের হিসাব—আমরা

করি মনের। আমরা দু'দলই কেরাণী। এখানে এসে আর্থিক উন্নতি কিছু হয় না, কেননা বাজার অনেক দূর। তবে মানসিক উন্নতি হয় কিনা সে বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

তাঁহারা—কি রকম মনে মনে আলোচনা ক'রছেন বলুন না শুনি, যদি বুঝতে পারি।

আমি—আচ্ছা, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের আপত্তি কি? ইংরাজীতে যাকে town আর gown এর ঝগড়া বলে, আপনাদের আপত্তি কি সেই ধরণের?

তাঁহারা—সোজা কোরে বলুন না—ঝগড়া করব, তাও বিলাতী ঝগড়ার অনুকরণ নাই করলাম।

আমি—এখানে আবার বিলাতী গন্ধ পেলেন কোথায়? এর মধ্যে শক্ত কথা পেলেন কোথায় যে বুঝতে পারছেন না? যা কিছু বোঝা যায় না, তাই বোধ হয় বিদেশী, নয়?

তাঁহারা—আজ্ঞা হাঁ, যা বোঝা যায়, যা প্রকৃতই বাস্তব তাই দেশী।

আমি—আমরা কি এতই অ-বাস্তব কথা কই যে সব কথা ধোঁয়া হয়ে যায়?

তাঁহারা—আজ্ঞা হাঁ। আপনি দেখছি নিজেদের দোষটি ঠিক্ ধরেছেন!

আমি—একটু চুপি চুপি কথা বলুন। নিজের দোষ ধরা অধ্যাপকের পক্ষে আত্মহত্যার মতনই পাপ কার্য্য। যাক্, এই কি আপনাদের আপত্তি?

তাঁহারা—অন্ততঃ একটা বটে।

আমি—অর্থাৎ?

তাঁহারা—এ সোজা কথাটি বুঝতে পারছেন না? কোন দুর্ব্বোধ্য কথা ব্যবহার করিনি ত!

আমি—এ বড় কঠিন সমস্যা! আপনারা আমাদের কথা বোঝেন না, আর আমরা আপনাদের কথা বুঝি না, অথচ প্রত্যেকেরই ধারণা যে কোন দুর্ব্বোধ্য ভাষা প্রয়োগ করা হয়নি।

তাঁহারা—কঠিন সমস্যা বটে, তবে আমাদের মধ্যে বোঝা পড়া চাইই চাই। আপনারা কষ্ট কোরে বিদ্যা অর্জ্জন ক'রেছেন, তার সুফল ভোগ করবার অধিকার এবং ঈপ্সা আমাদের যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। এবং আপনাদের মধ্যে পরকে উন্নত করবার ইচ্ছা সর্ব্বদা বলবতী র'য়েছে বোলেই সন্দেহ করি।

আমি—বাস্তবিক পক্ষে আমরা শিক্ষা দিতে ভালবাসি বোলেই আমরা শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন কোরেছি। শিক্ষা দেবার প্রবৃত্তি সব মানুষের মধ্যেই আছে। আপনারা কি ছুতো পেলেই শিক্ষা দিতে কসুর করেন?

তাঁহারা—তবে শিক্ষা দেবার প্রবৃত্তিকে আমরা বৃত্তিতে পরিণত করিনি। একটা কোন প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র কোরে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাতেই আমাদের দ্বিতীয় আপত্তি।

আমি—দ্বিতীয় আপত্তির কথা পরে শুনব। প্রথম আপত্তির কথাই আলোচনা করা যাক্। আমাদের ভাষার দোষ কি?

তাঁহারা—দোষ অনেক। প্রথমত আমরা মনে করি যে, প্রত্যেক জিনিষেরই এক একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে, যেমন ফুলের, শিশুর, যুবকের। কিন্তু আপনাদের মুখে তাদের বর্ণনা শুনলে মনে হয় যেন ভগবান তাদের মূক কোরেছেন আপনাদের মুখর

করবারই জন্য। হয়ত তাদের ভাষা নীরব, আর সে ভাষা ব্যতীত অন্যের ভাষায় তাদের গোপন কথা তারা ব্যক্ত করে না। কিন্তু আপনারা সে ভাষা আয়ত্ত করেন নি।

আমি—এ দেখছি আপনারা আমাদেরকেও হারালেন। ভাষা বিভিন্ন মানতেই হবে, তবে ফুলের ভাষা আছে, এবং সে ভাষা নীরব এ কথা কি কোরে মান্‌ব? ভাষা একমাত্র মনের, যার মন আছে তারই ভাষা আছে। ফুলের মন আছে, এ রকম আবিষ্কার জগদীশ বাবু পর্য্যন্ত করেন নি। শিশুর মন হয়ত থাকতে পারে কিন্তু রবি বাবু শিশুমনের পরিচয় দিতে গিয়ে আধ আধ ভাষা প্রয়োগ করেননি বোলেই স্মরণ হচ্ছে। শিশুর ভাষা শিশুর পিতামাতারই ভাল লাগ্‌তে পারে, আপনার আমার লাগ্‌বে কেন? আর যুবকের ভাষাই ত আমরা ব্যবহার করি। যুবকের মুখে কখনও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হতে শুনেছেন? বৈয়াকরণিককে জিজ্ঞাসা করুন, ভাষা কার? তিনি নিশ্চয় উত্তর দেবেন, ভাষা সর্ব্বসাধারণের, অর্থাৎ কারুর নিজস্ব নয়।

তাঁহারা—অতএব সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি থেকে আমরা বঞ্চিত হব কেন? শুধু তাই নয়, আপনি বোধ হয় নিজের উত্তর পরের মুখে চাপিয়েছেন। বৈয়াকরণিক যদি সত্য কথা কন্, তা হ'লে নিশ্চয়ই উত্তর দেবেন, 'ভাষা আমার'। আমরা বৈয়াকরণিকের হাতে ভাষা সমর্পণ কোরতে ইচ্ছুক নই।

আমি—আর্টিষ্টের কাছে রাখতে ভয় পান না ত?

তাঁহারা—নিশ্চয় না। তবে দুঃখ এই যে, আপনারা কেউ আর্টিষ্ট নন্। যদি হতেন, তা হ'লে গোলই থাকৃত না। প্রত্যেক বস্তুর বিভিন্ন সত্তা উপলব্ধি করা পণ্ডিতের কাছে সহজ হ'তে

পারে, কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর বিশিষ্ট রস গ্রহণ করা আর্টিষ্টের কাজ, আপনাদের কর্ম্ম নয়।

আমি—আপনারা ভিন্ন ভিন্ন রস গ্রহণ করতে পারেন? রস কি প্রত্যেক বস্তুর গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে? রস ত যে ভোগ করে তার মনের সম্পত্তি। যাই হোক্, আপনারা যে রস গ্রহণ কোরতে সমর্থ তার প্রমাণ?

তাঁহারা—এই যেমন আমরা ফুল ভালবাসি, শিশুর অত্যাচার সহ্য করি, এবং গান শুনে আপনার মতন ঘোরতরভাবে মস্তক সঞ্চালন না কোরেও বেশ আনন্দ পাই। আমরা কীর্ত্তন শুনতে বড় ভালবাসি, কিন্তু আপনি ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়া অন্য কোন প্রকার গান শোনাকে সময়ের অপব্যবহার বোলে মনে করেন।

আমি—আপনারা যখন বোলছেন যে আনন্দ পান তখন স্বীকার কোরতেই হবে। কিন্তু আমি ধ্রুপদ খেয়াল শুনে যে আনন্দ পাই, তার চেয়ে কীর্ত্তন শুনে আপনাদের আনন্দের মাত্রা যে বেশী হয় তার প্রমাণ কি?

তাঁহারা—প্রমাণ এই যে, আমাদের আনন্দ বেশীসংখ্যক লোক উপভোগ করতে পারে, এবং আপনাদের আনন্দ আপনাদের দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রমাণ এই যে, ভাল জায়গায় এসেও আপনার শরীর খারাপ হতে চলেছে, আর আমরা ধূলার মধ্যেও বেশ আছি।

আমি—আনন্দের মাত্রা তা হ'লে ভোটে ঠিক্ হবে? আপনারা ঠিকই বোলেছেন—এটা যে গণতন্ত্রের যুগ! আপনারা তা হ'লে আনন্দে আছেন ধূলার রস-গ্রহণ কোরে? আজকাল রাস্তায় জল দিচ্ছে না নাকি? যাই হোক্, এবার দ্বিতীয় আপত্তি পেশ কোরতে পারেন।

তাঁহারা—আপনারা অত শিক্ষা দিতে ভালবাসেন কেন? না হয় পুঁথিগত বিদ্যা আপনাদের চেয়ে আমরা কম জানি, কিন্তু শিক্ষকত্বের দাম্ভিকতা অন্যান্য প্রভুভাবের মতনই কি ঘৃণ্য নয়?

আমি—যথা—?

তাঁহারা—এই ধরুন প্রজার প্রতি রাজার মনোভাব, এবং বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিতা স্ত্রীদের ভাষায়—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনোভাব।

আমি—এসব মনোভাব কি অত্যন্ত খারাপ? শক্তির অধিকার নেই কি দুর্ব্বলতার ওপর প্রভুত্ব করার? শক্তিশালী ব্যক্তি যে প্রভুত্ব না কোরে থাক্‌তেই পারে না, আর দুর্ব্বলেরা সে প্রভুত্ব বরণ কোরবেই কোরবে। এই চলে আসছে চিরকাল ধরে—সেই জন্য অধিকার জন্মেছে।

তাঁহারা—অতএব আপনার মতে আমরা চিরকালই পরাধীন থাকব, মেয়েরা চিরকালই পরাধীন থাকবে? কেননা, এই রকমই হয়ে আসছে?

আমি—যতদিন আমরা দুর্ব্বল থাকব, (স্ত্রীলোকদের কথা স্বতন্ত্র) ততদিন আমরা পরাধীন থাকতে বাধ্য। এ বেশ সোজা কথা। সবল হয়েও আমাদের পরাধীন থাকা উচিত বলছি না ত! কেননা, তা হয় না।

তাঁহারা—আপনার মুখে শক্তির অধিকার শুনে আশ্চর্য্য হলাম। আমরা শক্তির অধিকার জানি না, জানি শুধু প্রেমের অধিকার।

আমি—আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে, আপনারা প্রেমের অধিকারও জানেন না। জানেন শুধু সংখ্যার অধিকার।

তাঁহারা—সংখ্যায় প্রেম আছে প্রমাণ কোরতে পারি।

আমি—প্রমাণ করুন। কিন্তু আপনাদের স্ত্রীরা শুনলে রাগ কোরবেন না?

তাঁহারা—আপনার মুখে স্বামীর প্রভুত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য শুনে আপনার স্ত্রী যতটুকু রাগ কোরবেন তার বেশী নয়।

আমি—বোলে যান্।

তাঁহারা—স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার তফাৎ এই প্রেমেই। আমরা স্বরাজ পেলেও আমাদের মধ্যে জন কয়েক শাসন কোরবেন, বাকী কয়জন শাসিত হবেন। শাসনকর্ত্তারা অধিক-সংখ্যক লোকদের মত নিয়ে শাসন করতে বাধ্য হবেন, এবং সেই জন্য সে শাসন শক্তির চেয়ে প্রেমের উপরই স্থাপিত হবে। স্বামীর প্রভুত্ব শুধু পুরুষের পৌরুষ নয়।

আমি—কথাগুলিতে খুব আদর্শবাদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণজ্ঞানে বোলছে, শাসন গায়ের জোরের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আপনারা নেহাৎ সাধারণ মানুষ বোলে মনেই হচ্ছে না।

তাঁহারা—আমরা যে একেবারেই সাধারণ এবং সর্ব্বসময়ে নিতান্তই সাধারণ, একথা দয়া কোরে মনে কোরবেন না। আমাদেরও মনের মধ্যে একজন দার্শনিক আছেন, যেমন আপনাদের মনের মধ্যে একটি অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি লুকিয়ে থাকেন, এবং সেই অ-দার্শনিক ব্যক্তি প্রায়ই উঁকিঝুঁকি মারেন—তবে লেখার মধ্যে নয়, এই যা দুঃখ।

আমি—তা হ'লে আমরা আপনাদের সাধারণ বোলে গণ্য করি এই হচ্ছে আপনাদের সত্যকারের আপত্তি ও বিরক্তির কারণ? যাই হোক্, আমার মধ্যে কখন সাধারণ মানুষের সন্ধান পান্ বলুন ত? আলাপটা ঘনিয়ে আসছে।

তাঁহারা—আপত্তির স্বরূপ নির্ণয় কোরেছেন বোলতে হবে! আমাদের সাধারণ গণ্য করার নামই আপনাদের দাম্ভিকতা। কিন্তু আপনাদের দাম্ভিকতার মূল্য নেই, কেননা, তার ভিত্তি হচ্ছে একজন আমাদেরই মতন সাধারণ মানুষের মনোভাব।

আমি—এই বোল্লেন সাধারণ মানুষটি কেবলমাত্র উঁকি ঝুঁকি মারে—আবার বোলছেন সেই সাধারণ মানুষই আদৎ! প্রথম কথাটি মানি, দ্বিতীয়টি মানি না।

তাঁহারা—প্রথমটি মান্‌লেই আমরা কৃতার্থ হব। যাই হোক্, কখন সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ পাই বলছি। এই যখন আপনাদের মুখে পরস্পরের নিন্দা শুনি, যখন আপনাদের প্রচারিত মতের সঙ্গে আপনাদের আচারের বৈষম্য দেখি। সত্য কথা বলুন্ ত', নিজেরাই কি নিজেদের মতগুলিকে সন্দেহ করেন না?

আমি—যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে আমার কর্ম্মকর্ত্তাদের বোলে দেবেন না, তা হ'লে বলি। আমি আমার নিজের প্রচারিত মতগুলিকে সন্দেহ করি, তবে গভীর রাত্রে, আলো নিভিয়ে দিয়ে, মশারির ভেতর শুয়ে। সম্ভবত আমাদের মধ্যে অন্যেও সন্দেহ ক'রে থাকেন। তবে তাঁরা এখনও আমার মত কাঁচা রয়েছেন। যখন পাকা হয়ে যাবো, অর্থাৎ যখন আমার মতটি জগতে চালাতে পারবো, অর্থাৎ যখন আমার system-কে সর্ব্বসাধারণে গ্রাহ্য কোরবে, তখন আর সন্দেহ থাকবে না। খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারের পর যদি যীশুখ্রীষ্ট সশরীরে সেণ্টপলের সামনে এসে বোলতেন, 'ওহে আমি মরিনি, আমাকে নিয়ে অত বাড়াবাড়ি কোরছ কেন? আমি অতি সাধারণ মানুষ ছিলাম,' তা হ'লে সেণ্টপল যীশুকে কি আবার ক্রুসে ঝুলিয়ে

দিয়ে চিরকালের মতন নিজের সন্দেহ দূর কোরতেন না ?

তাঁহারা—আপনারও ধর্ম্মপ্রচারের লোভ আছে না কি ? কি ধর্ম্মপ্রচার কোরবেন শুনতে পাব কি ?

আমি—আমার ধর্ম্ম এই যে, প্রত্যেক মানুষ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে সকল প্রশ্ন এবং সমস্যার সমাধান কোরবে—তা হ'লেই জগতে জ্ঞানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বিজ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে জগতের এবং জীবনের যাবতীয় প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আবিষ্কৃত হ'লেই প্রত্যেক মানুষ সংস্কৃত হয়ে উঠবে। কেন না, তখন আর খেয়ালী হৃদয়বৃত্তিগুলি থাকবে না, এবং মানুষ প্রকৃতির বদলে বৈজ্ঞানিকপুরুষের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মগুলির দ্বারাই চালিত হবে।

তাঁহারা—হৃদয়বৃত্তিগুলির ওপর এত রাগ কেন ? আপনি কি তাদের দ্বারা অত্যন্ত বিধ্বস্ত হন ? আর আপনি যদিও না হন, অন্যে তাদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে স্বীকার কোরতে কুণ্ঠিত হন না কি ? সত্য কথা স্বীকার কোরতে বৈজ্ঞানিক মনের কুণ্ঠা বোধ করা উচিত নয়।

আমি—আদিম বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে দেখছি আপনাদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। সেগুলির অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু বহুদিন যাবৎ জীবজগতের সঙ্গে জড়জগতের যে যুদ্ধ হচ্ছে, বৃত্তিগুলি কি সেই যুদ্ধান্তের সন্ধিসর্ত্ত নয় ? সন্ধি-সর্ত্তগুলি শুধু সুবিধার নামান্তরমাত্র। সন্ধিসর্ত্তকে চিরন্তন ভাবলে, কিম্বা জোর কোরে ব্যবহারিক জগতে চালাতে গেলে জীবনের মূল্য কমে যাবে। সুবিধাকে সত্য গণ্য কোরলে জীবনকে জড়ে পরিণত করা হয়। স্বীকার করছি, মানুষ অন্য

মানুষের ওপর ক্ষমতা বিস্তার করবার চেষ্টা করে এক আদিম প্রবৃত্তির বশে। সেই ক্ষমতা বিস্তারের একটি প্রধান উপায় শিক্ষা দেওয়া। আবার এও ঠিক্ যে, একজন মানুষ অন্য মানুষের কথা শোনে নিজেকে নীচু কোরে দিয়ে। বিনয় শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, ওটাও মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। এই ক্ষমতা বিস্তারের ইচ্ছা, এই অধম বিনয়ী ভাব, ও জ্ঞান-পিপাসা মিলে-মিশে শিক্ষার সৃষ্টি করেছে। তার ওপর সমাজ আবার তার সমাজিক মূল্য চাপিয়েছে। অতএব পরকে শিক্ষা দেবার দাম্ভিকতা শুধু আমাদের দোষ নয়, ওটা যারা শিক্ষিত হবার অভিলাষী তাদের এবং সমাজের দোষও বটে। সব ক্ষেত্রেই সুবিধা। তবে সুবিধাই একমাত্র সত্য নয় এ কথাও মানতে হবে। তা হ'লে আপনারা আমাকে প্রশ্ন ক'রতে পারেন, আপনি সত্য কাকে বলেন? যা আছে তাই, না যা হওয়া উচিত তাই? আমি বলি, Aristotle যা বোলেছিলেন, যা হওয়া উচিত তাই সত্য, কিম্বা বিজ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা চালিত হ'লে যা হবে, তার স্বরূপই হচ্ছে সত্য।

তাঁহারা—সাহেবের কথা তোলেন কেন? ভয় দেখাবার জন্য?

আমি—না, সে জন্য নয়, তবে কি জানেন, যখন Aristotle আমার মতাবলম্বী হন, তখন সে মতের কিছু মূল্য আছেই আছে। অতএব সাহেবের কথা বাদ দিয়েই বলা যাক্, সত্য দুই রকমের—এক যা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, আর এক যা সত্যকারের সত্য।

তাঁহারা—আচ্ছা সত্যের অত মিথ্যা সাজ্‌বার প্রয়োজন কি? সত্যের কি ইচ্ছা হয় না যে, আমরা তাকে সত্য বোলেই গ্রহণ করি? তা যদি না হয়, তা হ'লে বোলতে হবে, সত্যের এই লীলা অস্বাভাবিক এবং অনর্থক।

আমি—আপনারা যাকে লীলা বোলছেন দর্শনেও তাকে লীলা বলা হয়েছে। এই লীলা কিম্বা মায়ার কারণ, উৎপত্তি, কিম্বা উদ্দেশ্য কি কেউ বোলতে পারে না, তবে আমাদের কাজ বিচার কোরে যাওয়া মাত্র। এখানেও দেখুন না সেই বিচার-বুদ্ধির কতখানি প্রয়োজন! বিচারের পর যদি কিছু পরিমাণে সত্যের আভাষ পাওয়া যায়, তা হ'লেও বোলতে পারেন যে কোন লাভ নাই, কেননা, একবার আভাষ পেলে আর কেউ সে যায়গা থেকে ফিরে আমাদের বোলতে আসে না, সেই সত্যের মধ্যেই ডুবে থাকতে চায়।

তাঁহারা—তবে আপনারা যে আভাষ দিচ্ছেন সেটি সত্যের নয় তা হ'লে? আর যদি বিচার কোরে কিছু না বোলতে পেলাম তবে বিচার করার লাভ কি?

আমি—কিছু পেলেই তার সম্বন্ধে বোলতে যাওয়া কি আমাদের দাম্ভিকতারই সস্তা সংস্করণ নয়?

তাঁহারা—অত গোলমালে কাজ কি? আমরা দুইটি সত্য নিয়ে মাথা ঘামাই বা কেন? আমরা কেন সেই সত্যকে গ্রহণ কোরব না যেটি জ্ঞানের মধ্যে খানিকটা এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে রয়েছে? আমরা যদি বলি যে, আপনাদের আবিষ্কৃত সত্যটিই মায়া আর আমাদের অভিজ্ঞাত সত্যই ঠিক সত্য,—তা হ'লে কি বোলবেন?

আমি—না, আমার বলবার বড় কিছুই নেই, যদিও Pragmatism-এর বিপক্ষে অনেক কথা পড়েছি।

তাঁহারা—সব পড়া কথা ছেড়ে দিন। অতএব দুই সত্যের মধ্যে কোনটি প্রকৃত তা আপনি জানেন না? অতএব, আমাদের জ্ঞান-আঁখি খুললেই যে সব ভুল ধুয়ে-মুছে যাবে, এ

রকম বলা যায় না। তা হ'লে আপনার মতন শিক্ষার দরকার কি?

আমি—কি জানেন, সত্য পাওয়া না পাওয়া অনুভূতি-সাপেক্ষ হ'তে পারে, কিন্তু সত্য-সন্ধানের জন্য বিজ্ঞান সাধনার নিতান্ত প্রয়োজন আছে। আমি কিন্তু দুইএর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য পাই না।

তাঁহারা—অনুভূতি কি কেবল জ্ঞান-সঞ্চয়? আপনি বলেন, 'কেবল ধ্রুপদ শুনে যাও, তা হ'লেই দেখবে যে বাংলা গান কত নীচু স্তরের, আর ধ্রুপদে কত মজা'। আমরা যদি বলি যে, সে মজা পাওয়া কেবলমাত্র অভ্যাসের দোষ এবং আপনিও কীর্ত্তন শুনতে শুনতে ভাবে বিভোর হয়ে যাবেন এবং কীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বোলতে কুণ্ঠিত হবেন না? জ্ঞান-সঞ্চয় মানে অভ্যাস-সঞ্চয় করা, আর অভ্যাস মানে গোটাকয়েক সংস্কার মাত্র। শুধু সংস্কারের সাহায্যে ভালমন্দের সত্য রূপ কিম্বা মূল্য নিরূপণ করা যায় না। সংস্কার মায়া নয় কি?

আমি—এ প্রশ্নের উত্তর দর্শনে পাবেন, দার্শনিকে দিতে পারে না।

তাঁহারা—অর্থাৎ শিক্ষায় পারে, শিক্ষকে পারে না?

আমি—কতকটা। তা হ'লে আপনাদের আপত্তি ব্যক্তিগত মাত্র। আপনারা শিক্ষার বিরোধী নন্ শুনে সুখী হলাম। যা হোক্, আমাদের বিপক্ষে আপনাদের অন্য কিছু অভিযোগ আছে কি?

তাঁহারা—অভিযোগ কি দু'একটা? আচ্ছা, আমরা সব কিছু সমস্যা হিসাবে ধরব কেন? পৃথিবী কি একটা পরীক্ষা-কেন্দ্র?

আমি—সে কি! আপনারাই ত বলেন জীবন একটি পরীক্ষাস্থল!

তাঁহারা—বলি বটে, তবে আপনাদের মুখের ঝাল খেয়ে। আমাদের পরীক্ষাগারে অনেক লতাপাতা, ফুলফল, ছেলেপুলে, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া অন্য দুঃখ কষ্ট, এবং পাস করার আশা ছাড়া অন্যান্য আশা ভরসা আছে। সে পরীক্ষাস্থলের প্রশ্ন অন্য একজন করেন না, প্রশ্ন আমরা নিজেরাই করি এবং নিজেরাই উত্তর দিই, বই প'ড়ে নয়, অভিজ্ঞতা দিয়ে। এবং উত্তরও সে জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। আপনারা কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে ঠিক একই উত্তর প্রত্যাশা করেন। শুধু তাই নয়—আমরা পাস-ফেল করা ছাড়া যে অন্য ফললাভের আশা করি তার নাম আনন্দ। সে ফললাভের আনন্দ কত গভীর তা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রও হৃদয়ঙ্গম কোরতে পারে না। আমাদের পরীক্ষাগারে শুধু সমস্যারই সমাধান হয় তা নয়, সেখানে বেশীর ভাগ সময় খেলাই করি, গান গাই, নাটকের আখ্ড়া দিই, আবার সেখানে দেখাদেখিও চলে যে অন্যে কতখানি এগিয়ে গেলো।

আমি—সব পরীক্ষাগারেই শেষোক্ত ঘটনাগুলি ঘটে, তফাৎ যা ঐ আনন্দে।

তাঁহারা—আর এক তফাৎ আছে। আমরা উত্তরগুলি মাতৃ-ভাষায় দিয়ে থাকি—আমরা অবশ্য বেশীর ভাগ সময় উত্তর লিখি না, হিজিবিজি কাটি, এবং শিক্ষক পরীক্ষকের ব্যঙ্গচিত্রও এঁকে থাকি।

আমি—বেশ করেন। ও-রকম ইচ্ছা আমারও নাস্তিক মুহূর্ত্তে উদয় হয়।

তাঁহারা—যাক্, আপনি তা হ'লে একেবারে পুরোপুরি শিক্ষক হয়ে পড়েন নি।

আমি—তবে যদি আপনারা এ রকম ভাবে এসে প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা কন, তা হ'লে শিক্ষকতার কার্য্যে বাধা পড়ার ভয় আছে।

তাঁহারা—অনেক রাত্রি হয়ে গেল। আপনার মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার হ'ল। আমরা এখন উঠি।

আমি—না না মহাশয়। আপনারা আমার সোজা কথাটি যে রকম ভুল বুঝলেন, তাতে আপনারাই দার্শনিক আর আমিই অত্যন্ত সাধারণ বলে মনে হচ্ছে।

তাঁহারা—না, অনেক রাত হয়ে গেল। আপনার মুখের নল পড়ে যাচ্ছে। আমরা উঠি। নমস্কার।

*   *   *   *

হঠাৎ জেগে উঠে দেখি কেউ কোথাও নেই। রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম তা হ'লে! হাতে সেই Jacks-এর Alchemy of Thought! বাবা—আবার বই!

দ্বিতীয় স্তবক—সুরের কথা

আমার বন্ধুরা এ বৎসর আমার প্রতি সদয় হয়েছেন। তাঁহারা আর অতটা আমাকে দূরে পরিহার করেন না। আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘনঘনই হচ্ছে। ঘনিষ্ঠতার ফল কি হবে জানি না—তবে, 'মা ফলেষু কদাচন' মনে ক'রেই নিশ্চিন্ত আছি। এখন দেখছি যে, সহরের সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে গণ্ডীর ভেতর থাকলে মন বড়ই অনুদার হ'য়ে যায়। অধ্যাপকদের মনে পাণ্ডিত্য এবং পয়সার অভিমান আশ্রয় করেছে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তাই বোলে যে একধারে সহরের সাধারণ মনোভাবের সাহায্যে, এবং অন্যধারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া ও কুড়েমি বাদ দিয়েই অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক কোন বিপ্লব সাধিত হবে তাও মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেও Snobbishness, এবং বাইরেও তাই, তফাৎ এইটুকু যে প্রথমটি কু-শিক্ষার দাম্ভিকতা, এবং অন্যটি অ-শিক্ষার হিংসা। দুঃখের বিষয় এই, কুড়েমী যে মহাপাপ তা আজকালকার অধ্যাপকেরাও স্বীকার ক'রে নিয়েছেন—তাঁরা সব বই লিখতে ও বই পড়াতেই ব্যস্ত, লেখাপড়া করবার তাঁদের ফুরসৎ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সুবিধা এই,—সেখানে লোকসমক্ষে অন্তত গণেশ ঠাকুরের স্থান নেই। বোধ হয়, স্থান থাকা উচিতও নয়, কেন না ঠাকুরটি সাক্ষাৎ ভগবান নন, তবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁকে অলক্ষ্যে রেখে সাক্ষাৎ ভগবান বোলে পূজা করা, কাঁসর-ঘণ্টা বাজান, ধূপধুনা জ্বালান, তাঁর নামে বলি দেওয়া চলতে পারে। আর চলছেও তাই। কারুর কারুর সেই বাজনার আওয়াজে কান

কালা হ'য়ে যায়, সেই পূজার ধোঁয়ায় চোখ ধাঁদিয়ে যায়। আমাদের মধ্যে চালাক যে, সেই চোখকান বুজিয়ে পূজারী হয়, যে বোকা সেই পূজা দেয় না। আমি পূজারী হ'তে চাই না, পূজা দিতেও চাই না। আমি চাই মন্দিরের পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং মজা দেখতে। আমার কাছে ও দেবতা মিথ্যা, তবে জগতে বোধ হয় মিথ্যার অনেক প্রয়োজন আছে। জয় Jerome Coignard!

যা মিথ্যা বোলে জানি তা নিয়ে মারামারি হয় না, কিন্তু যে মিথ্যাকে সত্যের আকার দিয়েছি তাই নিয়ে ঝগড়া, মন-কষাকষি, মারামারি। যখন সত্যের আকারকে সত্য বোলে মনে করি, তখন অন্যে যদি সেই আকারকে পূজা না করে, তখন আমরা ব্যক্তিগতভাবেই আহত হই। কিন্তু মিথ্যাঠাকুরের সেবকবৃন্দ যে মনটিই হারিয়ে ফেলেছেন, তা তাঁদের মনেও থাকে না। থাকবেই বা কি ক'রে? মন বোলে পদার্থটিই যে বলি দেওয়া হ'য়েছে! এই হচ্ছে আমার 'আমাদের এবং তাঁহাদের' বিপক্ষে আপত্তি। আমার অন্তত মনকে বাঁচাবার বড় দরকার হয়েছে। মনকে জীবন্ত রাখবার চেষ্টার ফলে আমি কোন নৌকায় পা দিতে পারি না। শেষকালে মাঝ দরিয়ায় প্রাণ খোয়াতে হবে দেখছি!

* * *

সন্ধ্যার সময় বন্ধুরা এসে উপস্থিত। বেহারা এসে চা দিয়ে গেল। চা পানের সঙ্গেসঙ্গেই কথাবার্ত্তা চল্‌ল।

তাঁহারা—আচ্ছা, চায়ের সঙ্গে আপনারা এত কম চিনি খান কেন? আমরা চা মানে অন্তত চার চামচ চিনি বুঝি।

আমি—এই যে সেদিন আপনারা বলেছিলেন যে প্রত্যেক জিনিষেরই একটা নিজস্ব ভাষা আছে—যেটা আমরা, অধ্যাপকেরা, সর্ব্বদাই নষ্ট কর্‌তে চেষ্টা করি—সে কথাটি প্রাণে

লেগেছে। চায়ের লিকারের সঙ্গে দুধ চিনি মেশালে সেটি আর চা রইল না। প্রত্যেক পদার্থের শুদ্ধ সত্তা মানতে চেষ্টা করছি।

তাঁহারা—তা হোক্ মশাই, আরও একটু দুধ ও চিনি নিলুম—কিছু মনে করবেন না।

আমি—নিশ্চয়ই নেবেন। মানুষ তর্কের খাতিরে যা বলে তাই কি সব সত্যি! কিন্তু তা হ'লেও আমি অন্তত মনে করি যে বে-চিনি চা ভাল গাইয়ের মুখে হিন্দুস্থানী খেয়াল কিম্বা ধ্রুপদ শোনার মতন।

তাঁহারা—আর চিনি-দুধ-মেশান চা হচ্ছে বাংলা দেশের কীর্ত্তন, এই বলছেন ত'?

আমি—আজ্ঞে হাঁ, অন্তত আমি যে রকম কীর্ত্তন শুনেছি। তবে খগেন মিত্র মহাশয় লিখেছেন যে, কীর্ত্তন অনেক পাকা সুরে গাওয়া হ'ত, এবং এখনও হ'তে পারে। এখন বেশীর ভাগ লোকে যা কীর্ত্তন গায়, তাতে কথার তান এবং ভক্তির প্রাধান্যই বেশী—অর্থাৎ কেবল দুধ চিনি। যাক ও সব কথা, এখনি আবার তর্ক উঠবে, আজকাল তর্ককে বড় ভয় করি।

তাঁহারা—এরকম মতিগতি হ'ল কবে থেকে?

আমি—যেদিন থেকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর সঙ্গে মেশবার সুবিধা পেয়েছি সেই দিন থেকে আর গান সম্বন্ধে তর্ক করি না। আমার শুধু এইটুকু বলবার আছে যে, সঙ্গীতে আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি খুবই সচেতন। আমি কেবল গান সম্বন্ধে ভেবেই গেলাম, জীবনে করিৎকর্ম্মা হ'য়ে উঠ্‌বো, এ দুরাশা আমার নেই। যে নিজে হাতে কিছু কোরেছে তার সে সম্বন্ধে বলবার অধিকার আমাদের মতন শুধু তার্কিকের চেয়ে অনেক বেশী আছে স্বীকার করি। অবশ্য অধিকার থাকলেই যে তার সদ্ব্যবহার সর্ব্বদাই

হবে এমন কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। সেই জন্যই ত' ওস্তাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখা প'ড়তে চাই, কিন্তু প'ড়তে পারিনা।

তাঁহারা—তাঁদের মতামত আর উল্লেখ ক'রবেন না। তাঁরা বাংলা গান অবজ্ঞার চোখে দেখেন।

আমি—শুধু দেখেন না, অবজ্ঞার সুরে গেয়েও থাকেন। আশ্চর্য্যের কথা! যাঁরা ব্যবহারিক জগতে এত democrat, তাঁরা সুরের জগতে এত aristocratic হন কি কোরে আমি বুঝতেই পারি না।

তাঁহারা—কি জানি মশাই, আমরা মূর্খ মানুষ গানের সম্বন্ধে, তবে এইটুকু নিজেদের মনের কথা আপনাকে বোলতে পারি যে, গানের যদি কথাই না বুঝতে পারি, তা হ'লে গান হ'ল না; হয়ত সুর হ'ল, কিন্তু সে সুরে চিঁড়ে ভেজে না, প্রাণে আরাম পাই না।

আমি—ভাল কথা। এতে আর তর্ক কোথায় বাধ্‌ছে? আপনাদের শুধু সুর ভাল লাগে না, কারুর ভাল লাগে, ব্যস্। আমার সবই ভাল লাগে, গাইতে পারলে। আপনাদের কী গান ভাল লাগে?

তাঁহারা—ভাল লাগে কীর্ত্তন, বাউল, সেন মশাইয়ের গান, রজনী সেনের গান, রবিবাবুর গান, এমন কি আপনাকে বোলতে আর লজ্জা কি—থিয়েটারের গান পর্য্যন্ত, তবে ঐ ওস্তাদী গান কিছুতেই নয়। সব চেয়ে খারাপ লাগে ওস্তাদের মুখে বাংলা গান।

আমি—আমার কাছে যে নির্লজ্জভাবে কথা কইলেন এর জন্য ধন্যবাদ। বাকী সব গান আপনাদের ভাল লাগে বুঝতে পারি, ওস্তাদী ভাল লাগে না বুঝতে পারি, কিন্তু রবিবাবুর গান ভাল লাগে স্বীকার করা অত্যন্ত দুঃসাহসের কথা

বোলে মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, রবিবাবুর গান, যাঁদের আপনারা cultured snobs বলেন, কেবল তাঁদেরই ভাল লাগতে পারে—এই ধরুন, যাঁরা পর্দ্দা মানেন না, যাঁদের মোটর আছে, যাঁরা মেয়েলী ভাবে কথা কন, এবং সুর সম্বন্ধে কিছুই না ভেবে গান ভালবাসেন বোলে থাকেন।

তাঁহারা—দেখুন, ঠাট্টা জিনিষটা তর্ক নয়।

আমি—তর্ক নয় সে কথা মানি, কিন্তু গালাগালির অপেক্ষা ঠাট্টার সাহায্যে তর্কে বেশী সহজে জেতা যায়।

তাঁহারা—সে যাই হোক্—আমাদের মনে হয় যে, গানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতাকে ফুটিয়ে তোলা। এই যেমন 'সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই', যদি আপনি অত্যন্ত চীৎকার ক'রে গান তা হ'লে আমাদের কখনও ভাল লাগবে না। রজনীকান্তের 'ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে' গাইবার সময় বোমা ফাটার আওয়াজ কানে আপনারই কি ভাল লাগে, তা সুর যতই শুদ্ধ হোক্ না? আবার দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' গানটি বেশ জোরে তেজের সহিত গাইতে হবে—তা না গেয়ে, যদি কবিতার অন্তর্নিহিত রস কিম্বা ভাবটিকে অগ্রাহ্য কোরে কেবল সুরের কেরদানী দেখান, তা হ'লে আমাদের মর্ম্মস্পর্শ ত কোরবেই না, উচ্চ সঙ্গীতও হবে না। আমরা সাধারণ লোক, আপনার সঙ্গে গানের আলোচনা কোরতে ভয় হয়।

আমি—লজ্জা, ভয়—এ দুইই হয়! বাকীটা প'ড়ে থাকে কেন? ঘৃণাটাও প্রকাশ করুন না, তা হ'লেই ষোল কলা পূর্ণ হবে! যাই হোক্, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়---এ তিন থাকতে নয়, অতএব সেগুলি অবহেলে দূরে ফেলে আসুন, বুদ্ধির সাহায্যে তর্ক করা যাক্। যতক্ষণ আমার 'ভাল লাগে' এবং 'আপনার

ভাল লাগে 'না' সঙ্গীতের কষ্ঠিপাথর হবে, ততক্ষণ কোন মীমাংসাই হ'তে পারে না। কেননা, আমার ভাল লাগে অতএব সেটি ভাল বল্‌বার দাম্ভিকতা আমার নেই, এবং কেবল আপনাদের ভাল লাগে বোলেই যে সেটি আমার আদরের সামগ্রী হবে, এ রকম বিনয় আমার ধাতে নেই। তর্কবুদ্ধি দিয়ে উপভোগ করা যায় না জানি, কিন্তু কেবলমাত্র ঐ যন্ত্রের সাহায্যেই কোনটি ভাল লাগা উচিত এবং কেন ভাল লাগল ঠিক করা যাবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবশ্য আমরা মানুষ রয়েছি, —তার পর যদি থিয়সফিষ্টদের আশা অনুযায়ী সকলেই অতিমানুষ হ'য়ে যাই, তখন না হয় intuition-এর সাহায্য নেওয়া যাবে। কি বলেন ?

তাঁহারা—এক হিসাবে আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, কিন্তু গান শোনবার সময় তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তগুলি ভুলেই যাবো। এখন যেকালে আপনি গান গাইছেন না, তখন তর্কই করা যাক্,—সময় কাটান চাই ত !

আমি—বেশ। গোলমাল বাধে সুর এবং কথা নিয়ে। ওস্তাদেরা বলেন, সুর প্রধান, আপনারা বলেন, কথা প্রধান। অর্থাৎ, তাঁদের মতে কথা সুরের দাসীগিরি কোরবে, এবং আপনাদের মতে সুরই কবিতার দাসীগিরি কোরবে। প্রথমে আপনাদের মতই আলোচনা করা যাক্। এই মতের স্বপক্ষে আপনারা আর কি বলেন শুনি ?

তাঁহারা—আমাদের গানে সুরও রয়েছে, কথাও রয়েছে, অতএব যে গানে শুধু সুর আছে তার চেয়ে আমাদের গানে একটি বেশী অলঙ্কার রয়েছে, যার দ্বারা আমরা গানের ভাবকে বেশী উপলব্ধি কোরতে পারি।

আমি—এ দেখছি বরকর্ত্তার কথা। একটি বেশী গহনা দিলে কি আপনাদের পুত্রবধূটি 'সুন্দরতরী' হ'য়ে উঠবে? যদি গহনাটি বে-মানান হয়?

তাঁহারা—সে'ত পূর্ব্বেই বোলেছি—গহনাটি মানানসই হওয়া চাই।

আমি—আর যদি কচি মেয়েটি শুধু গহনা না প'রতে চায়?

তাঁহারা—কোন্ মেয়ে শুধু গহনা চায় না দেখিয়ে দিন?

আমি—এই যাঁরা গহনার সঙ্গে বেনারসী চান্। উপমা ছেড়ে দিলেই বুঝতে পারবেন যে, কবিতার গায়ে সুরের গহনা খাপ খাওয়ান বড় জহুরীর কায। কেননা, সাহিত্যের রস সুরের রস হ'তে বিভিন্ন, সাহিত্যের বিষয় বিভিন্ন, সাহিত্যের পদ্ধতি বিভিন্ন।

তাঁহারা—বুঝলাম না।

আমি—না বুঝে বড় আনন্দ দিলেন। গানও ভাষা, কবিতাও ভাষা, তবে গান, রাগ, লোভ, মোহ, প্রেম প্রভৃতি মনোভাবকে প্রকাশ কোরতে ব্যস্ত নয়। সাহিত্যের কারবার ঐ সব নিয়ে। সুর অত্যন্ত অ-বাস্তব জিনিষ, সুরের রাজত্বে 'মন হার মেনে যে কাঁদে'। মন সেখানে একটি ইন্দ্রিয় মাত্র, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরই মতন। ওস্তাদেরা চোখ বুজে, কানে আঙ্গুল দিয়ে গান গেয়ে থাকেন, দেখেন নি কি? সাহিত্য কিন্তু মনোভাবের পর্য্যায়ই প্রকাশ ক'রে আসছে, সেই জন্য গদ্য কিম্বা পদ্য ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যও যে অ-বাস্তব হয় না তা বলছি না, তবে সাহিত্যের স্তর সুরের স্তর হ'তে ভিন্ন।

তাঁহারা—বীণা শুনে আলেকজান্দারের মনে কত রকম ভাবের উদয় হয়েছিল পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি।

আমি—আমাকেও পড়তে হয়েছিল, কিন্তু সে কবিতার লেখক ড্রাইডেন, যাঁর কবিতা লেখা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না, কবিত্বই যাঁর একমাত্র ব্যবসা ছিল। যাক্, আমি ত Sir Oracle-এর মতন পার্থক্যের কথা কেবল জোর কোরে, ঘন গলায় বোলেই গেলাম—এখন বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই ধরুন, লক্ষ্ণৌএর এক টঙ্গাওয়ালা 'বেচ্‌নে যাতি দহিরি' গান গাইতে গাইতে এই শীতের রাত্রে টঙ্গা হাঁকাচ্ছে। অস্থার্থ এই যে, গোয়ালিনী দই বেচতে যাচ্ছেন, কান্‌হাইয়া তাঁর ওড়না ধরেছেন, কিছুতেই ছাড়বেন না, শেষ কালে গোয়ালিনী শ্যামের গালে একটি ছোট্ট অথচ জোরাল ঠোনা মেরে দই বেচতে গেলেন। শ্যাম-পিয়ারীর মনে কি কি ভাবনা উঠেছিল আপনারা সকলেই বুঝতে পারেন। এবং টঙ্গাওয়ালাও বুঝতে পেরেছিল —সেই জন্য সে কখনও ত্রস্ত, ভীত, শঙ্কিত, কখনও রাগান্বিত, কম্পিত, কখনও অনুশোচনাপূর্ণ হৃদয়ে গানটি গাইছে। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে।

তাঁহারা—লক্ষ্ণৌএর টঙ্গাওয়ালার মধ্যে এখনও ভাল গাইয়ে আছে।

আমি—নিশ্চয়—শুনুন তার পর কি হ'ল। হঠাৎ সে 'দহিরি' কথাটির 'ই'কারের ওপর তান ধরল। তখন আর তার গলায় ওসব বস্তুগত ভাব পাচ্ছি না, যা পাচ্ছি তার নাম জানি না, সেটি একটি গতি মাত্র, অথচ আপনাতে আপনি পূর্ণ, একটি সাবলীল ক্রীড়া যার রীতি-নীতি বাইরের জগতের নয়, নিজের জগতের, যেখানে স্বার্থের লেশমাত্র নেই।

তাঁহারা—স্বার্থ কেন আসবে?

আমি—এইত' এতক্ষণ ছিল, দইএর হাঁড়ি বাজারে নিয়ে না বেচতে পারলে গোয়ালিনী বাড়ীতে এসে মুখ দেখাবে কি কোরে ? সেই জন্যই ত সে কান্‌হাইয়াকে ঠোনা মেরে চলে যেতে চেয়েছিল, হঠাৎ টঙ্গাওয়ালা তান তুললে তাই না সে থেমে গেল ?

তাঁহারা—তার পর ?

আমি—তার পর আর কি ? তান ফুরিয়ে এল, টঙ্গাওয়ালা বাস্তব জগতে ফিরে এলেন—এবং ঠোনা খাওয়ার প্রতিশোধ নিলেন, ঘোড়ার পৃষ্ঠে চাবুক মেরে। গানও থেমে গেল, কবিতাও চুকে গেল, টঙ্গাওয়ালা পিয়ারীর মতনই নিজের কাযে গেলেন—অর্থাৎ সোয়ারী খুঁজতে।

তাঁহারা—এর থেকে কি প্রমাণ হ'ল ?

আমি—প্রমাণ আর কি হবে ? আর্টিষ্ট ব্যবহারিক জগতের ধার ধারেন না; সাহিত্যিক একথা জেনেও জানেন না, কেননা, জানলে তাঁর চলে না, তাঁর লেখা লোককে বোঝাতেই হবে, সেই জন্য ব্যবহারিক জগতকে তাঁর একটু খোসামোদ কোরতে হয়; আর গায়ক—সে যখন তান তোলে তখন তার কাউকে সে তানের মানে বোঝাতে হয় না, সে জানেও না যে জগৎ আছে কি না, বোধ হয় জগৎ তাকে বড় অবহেলা কোরেছে, এই জন্যই সে জগতের কথা ভুলে গিয়েছে। সে যাই হোক্, এঁরা দু'জনেই আর্টিষ্ট, আমাদের পৃথিবীতে তাঁরা অন্য লোক থেকে দূত হ'য়ে এসেছেন—সেই জন্য তাঁদের বাসস্থান আমাদের জমিতে হ'লেও তাঁদের নিয়ম-কানুন সবই আলাদা। আইন অনুসারে তাঁদের কার্য্যাবলীর ওপর আমাদের কোন হাত নেই। চাই কি, আমরা কেউ কেউ তাঁদের চাকরী নিয়ে, রাস্তায় অন্য লোককে খুন কোরে, তাঁদের আশ্রয়ে নিজের

প্রাণ বাঁচাতে পারি। যেমন আমি কর্‌ছি। ও সব কথা ছেড়ে দিন—প্রত্যেক আর্টিষ্টই এই ব্যবহারিক জগতের উৎপন্ন মানসিক অবস্থাকে Spring-board-এর মতন ব্যবহার করেন—তাকে ঠেলে জয় মা বোলে আকাশে ঝাঁপ দেন। সাহিত্যিক বেশীক্ষণ আকাশে থাকতে না পেরে জলে প'ড়ে যান—ধরণীর সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ কিঞ্চিৎ বেশী, এবং গায়ক আকাশের স্বাধীনতা পেয়ে আরো উঁচুতে উড়তে চান। তাঁর পাখাতেও মোম আছে, তাঁকেও পড়তে হয়। পাখীরা উড়তে পারে—আমি মানুষ—আমি কেন পারব না—এরকম ন্যায় মাথায় আসে এক প্রকার অবস্থায়। সেই জন্যই বোধ হয় সুর এবং সুরার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তাঁহারা—সেই জন্য অন্তত সুর গাওয়া উচিত নয়।

আমি—ঠিক্ বোলেছেন। পুসিফুট্ ও-কথা বোল্‌তে পারতেন।

তাঁহারা—দেখুন, মাথায় গোটা কয়েক আপত্তি গজ্‌গজ্ কোরছে। বোলে ফেলি, গ্যাস বার করাই ভাল, কি বলেন? আপনি বোল্লেন সুর নিজের নীতিতে চলবে—অর্থাৎ আমরা যাকে বলি নিজের খেয়ালে, বেশ, তা হ'লে সুরের রাজ্যে ব্যক্তির স্থান কোথায়? সুরের কি তা হ'লে expression থাকবে না? আপনি যাই বলুন, ওসব কথা বড় high-browed বোলে মনে হচ্ছে।

আমি—প্রথম দুটি প্রশ্ন একই আপত্তির দুইরূপ—আমি তার জবাব পরে দিচ্ছি। শেষ আপত্তিটা বড় মজার। একটু বিশদ কোরে বলুন।

তাঁহারা—যখন কোন আর্টিষ্ট বলেন 'আমাদের জগৎ বিভিন্ন, তোমরা আমাদের মনের খোঁজ পাবে না,' তখন কি

আমরা তাঁকে এই উত্তর দিতে পারি না, 'বাপুহে, তা হ'লে তোমার আর্টেরই দোষ'? আর্ট মানে কোন গুপ্ত মন্ত্র নয় যে অন্যে বুঝতে পারলেই তার শক্তি লোপ পাবে। কিন্তু এই আর্টিষ্টরাই এবং আপনার মতন সমালোচকবৃন্দই আর্টকে একটি esoteric ব্যাপার কোরে তুলেছেন—যার গুপ্ত মন্ত্রের দ্রষ্টা আপনারাই, সাধক আপনারাই। আপনিই কতবার গণপূজার বিপক্ষে আপত্তি তুলেছেন এই বোলে যে হট্টমন একটি মিথ্যা মন্ত্র, এবং সেই মিথ্যা মন্ত্রের প্রচার করেন তাঁরাই যাঁরা এই মন্ত্রের ওপর একটি cult খাড়া কোরে নিজেদের কায গুছিয়ে নিতে চান্। যদি গুপ্ত মন্ত্রের বিপক্ষে হন, তা হ'লে এই রকম গুপ্ত cult-এর বিপক্ষেও অস্ত্র ধরুন।

আমি—কিন্তু আর্টের কার্য্যকলাপ গুপ্ত কে বোল্লে? নিজে আর্টিষ্ট হয়ে দেখুন না, তখন বুঝবেন যে আর্টের প্রকৃতি অত্যন্ত সরল, সহজ, এবং প্রকাশ্য।

তাঁহারা—তাই যদি হয় তাহ'লে ছবিতে লম্বা আঙ্গুল কেন হয় বুঝি না কেন, সুরের ওস্তাদি বুঝি না কেন, আপনার কাছে impressionist, expressionist প্রভৃতি কত দলের ছবি রয়েছে, তার মধ্যে একটাও ভাল লাগে না কেন?

আমি—কারণ অবশ্য রয়েছে, তবে যদি আহত না হন তা হ'লে বলি। আপনারা ভয় পান বোলে। বেশ সহানুভূতি দিয়ে বুঝুন দেখি, পারেন কি না? ভয়ে ঈর্ষা আসে।

তাঁহারা—এখানে ঈর্ষা কোথায় এল?

আমি—ঈর্ষা এল যখন আপনাদের political আত্ম-মর্য্যাদায় ঘা পড়ল। কিছুদিন থেকে মানুষ বড় অসহিষ্ণু হ'য়ে

পড়েছে। যদি কেউ কাউকে বলে 'তুমি আমার চেয়ে ছোট', সে কথাটা না তলিয়ে দেখেই তার নাকে ঘুষি মারবে, তার পর প্রশ্ন তুলবে 'আমি তোমার চেয়ে কিসে কম? আমিও ভালবাসি, আমিও ইংরাজি জানি, আমিও বার্ক, মিল পড়েছি, আমারও ভোট আছে—আমি কিসে কম?' মণ্টেগু সাহেব এদেশে আসবার পর থেকে কেউ যে আমাদের চেয়ে বড়, এমন কি ভিন্ন হ'তে পারে তার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত আমরা সহ্য করি না। কোন লোক দেখলেই আমরা তাকে এই বোলে প্রথম সম্ভাষণ করি 'দেখবেন, যেন চাল দেবেন না, তা হ'লে ঘুঁষি মারব'। আমি বলি, এ রকম অবস্থা সুস্থ মনের চিহ্ন নয়। আর্ট ও আর্টিষ্টের প্রতি অনাদরের কারণ political। অথচ আর্টিষ্ট বেচারীরা ত প্রাণপণে আপনাদেরই সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা কোরছেন। যখন ওস্তাদকে বাড়ীতে মুজ্‌রা দেন, তখন সেকি প্রাণপণে আপনাকে সন্তুষ্ট কোরতে চেষ্টা করে না? তবে তার সন্তোষদানের বিধানটি আপনার কাছে কটু ঠেকতে পারে। একবার ওস্তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখবেন, দেখতে পাবেন সে বেচারী কত প্রাণপণে চেষ্টা কোরছে বাহবা নেবার জন্য, একটু হেসেছেন ত বেচারী সেলাম কোরতে কোরতে অস্থির, একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে বন্ধুর সঙ্গে গল্প কোরেছেন কি বেচারী বিমর্ষ হ'য়ে গিয়েছে। অনবরত এই রকম অপমান সহ্য কোরলে তারাও যে দাম্ভিক হবে না এ রকম আশা করাই অন্যায়। ওস্তাদ যখন গায় তখন সে থাকে নিজের রাজত্বে, সেটি আপনার নয়, আমার নয়, সে আপনাকে ব্যক্ত কোরছে তার সুরের ভাষায়, যতদূর সে পারে ততদূর। আপনি এই ব্যবহারিক জগতে রইলেন, সে

যে অন্য জগতের ভাষায় কথা কচ্ছে তা জানলেন না, সে ভাষা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করা দূরে থাক তার কাছে প্রত্যাশা কোরলেন যে সে অন্য জগতের খবর দিক আপনাদের বোধগম্য ভাষায়। এমন কি তার কাছে চেয়ে বোসলেন এই জগতেরই একটী রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব। সে বেচারী আপনার এই প্রকার সদিচ্ছা পালন কোরতে পারল না, তার ক্ষমতা নেই বোলেই। আপনাদের আব্দার মেটাতে পারলে না বোলেই না তাকে দাম্ভিক বোলছেন! আমায় একটা প্রশ্নের উত্তর দিন—কেন তার কাছে এই সব চেয়েছিলেন? পৃথিবীতে আপনার গণ্ডীই কি একমাত্র গণ্ডী? আপনাদের আপত্তি এক কথায় আর্ট সংক্রান্তই নয়, পলিটিক্স্ সংক্রান্ত। ডিমক্রাসীই আপনাদের সর্ব্বনাশ কোরেছে। ঐ জিনিষটা আপনাদের সাম্য শিখিয়ে দাম্ভিক কোরেছে, ঈর্ষাপরায়ণ কোরেছে। যে আর্টিষ্ট সে দেবতার বাচ্ছা।

তাঁহারা—আপনার বক্তৃতা শুনে বড়ই উপকৃত হলাম। আপনার বিনয়ের সীমা নেই। আমরা জানি আপনি একজন ওদেরই দলের।

আমি—বাপ তোলেন কেন মশাই? আমার বাবা মানুষ ছিলেন, এবং আপনাদের মত নেহাৎ ভালমানুষটি ছিলেন না। আমি আর্টিষ্ট নই, artistic—

তাঁহারা—আপনি যাই হোন, তর্কটা অন্য পথে নিয়ে যাবার আপনার কোন অধিকার নেই।

আমি—আজ্ঞে হাঁ আছে—একটি জন্মগত অধিকার আছে, বাপ দাদা দেবতা নন্, সব উকীল মাষ্টার, যাই হোক্, এবার সেই মৌলিকতা, expression সংক্রান্ত আপত্তির জবাব দেবো।

একটু ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে—বক্তৃতা দিতে বেড়ে লাগছে, আপনারা এই রকম মাঝে মাঝে আসবেন। হ্যাঁ, মৌলিকতা আর expression একই জিনিষ।

তাঁহারা—রাবণের দশটা মাথাকে একটা কোরলে রামের পক্ষে সুবিধা হয় কিন্তু রাবণের তাতে হয়ত অসুবিধা হ'তে পারে।

আমি—যতটা অসুবিধা ভাবছেন ততটা নয়, দশটা মাথা নিয়ে শীতের রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় স্ত্রীর দিকে পাশ ফেরার কথা মনে করুন। আপনাদের এবং আমাদের সকলেরই ধারণা এই যে, আমাদের রাগিণীর যেকালে পর্দ্দা বাঁধা তখন একমাত্র ব্যক্তিগত মৌলিকত্বের স্থান expression-এ, অর্থাৎ নয় মুখ-ভঙ্গীতে, নয় গলার আওয়াজে। যেমন, রজনী সেনের 'ফুটিতে পারিত গো' গানটিতে একটি পদ আছে 'ছু'দিন ভেসেছিল সুখ বিলাসে'। সেই সময় গলার আওয়াজটি ভাসিয়ে দিতে হবে, মুখটি করুণ কোরতে হবে, তবেই আপনারা বুঝবেন যে প্রাণ দিয়ে গাইছে, তবেই সুরে expression খুঁজে পাবেন। বেশ কথা, তা হ'লে গানের অন্য পদেও প্রাণ প্রত্যাশা করুন, যেমন 'ছুদিন হেঁসেছিল, ছুদিন কেঁদেছিল' গাইবার সময় গায়কের একবার হো হো করে হাসা উচিত, একবার ভেউ ভেউ কোরে কাঁদা উচিত। একবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম—

তাঁহারা—জানি সে গল্প, রিজিয়া প্লে হচ্ছিল ত ?

আমি—হুঁ, আর একবার হালিসহরে ঐ রকম ঘটনা ঘটেছিল। একটি ছেলে প্রফুল্ল সাজে। ছোট ছেলেটি—গোপাল বুঝি তার নাম—তার মরবার সময়, প্রফুল্ল এমন মড়াকান্না তুললে যে, লোকেরা হেসে অস্থির। আমি সাজঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলাম যে প্রফুল্ল অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছে, লোকে

তার মাথায় জল দিচ্ছে, তবু তার কান্না থামে না। অবশ্য ও রকম expression আপনারা চান না, অত বাড়াবাড়ি নয়, তবে ঐ ধরণের একটা কিছু। অর্থাৎ গান গাইবার সময় গাইয়েকে ভাও বাতাতে বলেন, নাচতে বলেন, অ্যাকটিং কোরতে বলেন। সে বেচারী অত কাজ এক সঙ্গে পারবে কেন? সে যে সুর নিয়েই ব্যস্ত।

তাঁহারা—তা হ'লে গাইয়ে শুধু তোতাপাখীর মতন স্বরসাধন কোরে যাবে—শুধু সার্গমই গেয়ে যাবে? expression এবং individuality আপনি মানেন না?

আমি—লাখ বার মানি। মানি বোলেই ত' যার-তার গান ভাল লাগে না। প্রথমে কি মানি না তাই বলি। Expression হচ্ছে বিলাতী বুলি। ক্রোচে সাহেব এই কথাটা আজকাল বাজারে চালিয়েছেন। তাঁর ভাবের ঘরে কোথায় চুরি তা সমালোচকেরা ধরে দিয়েছেন। আর্টের মানে ভাবের অভিব্যক্তি নয়, কেননা, কোন ভাবের অভিব্যক্তি একটি কমা, ফুলষ্টপেও খোলে। আর্ট ভাবের অভিব্যক্তি যদি হ'ত, তা হ'লে এক আর্টের সঙ্গে অন্য আর্টের পার্থক্য কোথায় থাকত? প্রত্যেক আর্টের বিষয় বিভিন্ন, উপায় বিভিন্ন, যে ভাব ব্যক্ত হচ্ছে তার স্বরূপ এবং প্রকৃতি বিভিন্ন, এবং প্রকাশের রীতিও বিভিন্ন। Expression বোলতে প্রত্যেক আর্টের যে ল, সা, গু বোঝা যায় সেটি ওজন-জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়। ভাবের কতটা প্রকাশ কোরলে, কথার, রংএর, লাইনের, স্বরের, পাথরের আঁশের অন্তর্নিহিত স্বরূপটি প্রকাশিত হবে এই বুঝতে পারলেই আর্টিষ্ট হওয়া যায়। এই প্রকাশ করার নামই ওজন-জ্ঞান, যে প্রকাশ কোরতে পারে, সে ব্যক্তিই person, original এবং

তারই expression আছে, অন্যের নেই। যাকে feeling for the medium বলে তার নামই expression। এ নয় যে আমি একটি ব্যক্তি, অতএব আমার অভিজ্ঞতা একপ্রকার, তুমি আর একটি ব্যক্তি অতএব তোমার অভিজ্ঞতা অন্যপ্রকার, অতএব আমার কানাড়া তোমার কানাড়া থেকে বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। যে ব্যক্তি কানাড়ার কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত ও কোমল নিখাদের মজা দেখাতে পারে, যে রেখাবের মহিমা বোঝাতে পারে, যে মধ্যমকে আদর কোরে ঘোমটা তুলে দেখাতে পারে সেই ব্যক্তিই আর্টিষ্ট। আর্টে আবার এ ছাড়া ব্যক্তিত্ব কোথায়? আমি সঙ্গীত-স্রষ্টা অর্থাৎ composer-দের কথা কিম্বা বড় ওস্তাদের কথা বলছি না—তাঁরা নিজেদের style গড়ে তুলেছেন সেখানে ব্যক্তিত্ব বজায় রয়েছে। কিন্তু সাধারণ গায়কের পক্ষে প্রত্যেক note-এর শক্তি, potentiality দেখানই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেই জন্য মাছিমারা কেরাণীর মতন ভাল ভাল গান মুখস্থ করা উচিত, ভাল আর্টিষ্টের কাছ থেকে। যখন স্বর ও সুরের স্বরূপ বুঝব তখন সৃষ্টি কোরতে পারব, এ বাঁধা-ধরা নিয়মের ভিতরেও।

তাঁহারা—এ একটা কাজের কথা বোল্লেন এতক্ষণের পর, কিন্তু আর্টিষ্ট কই?

আমি—দেখুন অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছে,—সেইজন্য বোধ হয় চোখ জুড়ে আসছে। এখনি চেয়ার ছেড়ে উঠে খুঁজতে পারছি না, কাল পেলে হবে না? আশা করি অত তাড়াতাড়ি নেই।

তাঁহারা—অত ঠাট্টা কোরবেন না। বুঝেছি, আপনার খাবার দেরী হয়েছে। আচ্ছা, আসছে শনিবার এসে আপনার

মুখে রবিবাবুর গান সম্বন্ধে মন্তব্য শোনা যাবে। রবিবাবুর গান আপনার মতে না সুর, না কবিতা, অর্থাৎ সঙ্গীত। কোথায় সঙ্গীতকে বসান দেখা যাবে!

আমি—মাথার ওপর মশাই, মাথার ওপর। এই যেখানে আপনাদের বসাতে ইচ্ছা করে।

তাঁহারা—তা হ'লে হৃদয়ে নয়?

আমি—Two things cannot occupy the same space; কি কোরব, ইয়ুক্লিডের দোষ!

* * *

বন্ধুরা বিদায় নিলেন। এ সব কী কথা হ'ল? তর্ক কোরতে গিয়ে বুদ্ধিতে শান্ পড়ে, কিন্তু অন্যকে শানের পাথর ভাবতেও ত' ভাল লাগে না। মনকে বাঁচাতে গিয়ে হৃদয়কে হারাতে হয়। বুদ্ধি দিয়ে রসভাগ হয়, রসভোগের জন্য আর একটা আস্ত বড় জিনিষের দরকার—সেটা বুদ্ধিরও বড়, প্রাণেরও বড়। এমন কি উপভোগ করবার ইচ্ছাশক্তির চেয়েও বড়, অথচ সব মিলিয়ে একটা। সেটা আমার মধ্যে রয়েছে, অথচ আমাকে নিয়েও রয়েছে। তার নামই কি Personality?

তৃতীয় স্তবক—সঙ্গীতের কথা

এক সপ্তাহ না যেতে যেতে তাঁহারা এসে উপস্থিত। দেশের লোক যখন গানের আলোচনা কোরতে নদী পার হ'য়ে আমাদের মতন snobsদের বাড়ী অত ঘন ঘন আসতে পারেন তখন তাঁদের অন্তত সঙ্গীতপ্রিয় না বোলে থাকতে পারা যায় না। আমি যদি গাইতে পারতাম তা হলে দেখছি তাঁরা সাগর পর্য্যন্ত পার হতে দ্বিধা কোরতেন না। সাধে কি ওস্তাদেরা বলে যে বাঙ্গালীর মতন কদর্‌দান আর কেউ নয়। বাঙ্গালীর সঙ্গীতপ্রিয়তা এ অঞ্চলের একটি সুপরিচিত প্রবাদ। আমার কিন্তু এই ধরণের প্রবাদ-বাক্যের সাহায্যে আত্মসম্মান বাড়ান ভাল লাগে না। ইংরাজ-জাতি গান বাজনা ভালই বাসেন না, এবং তাঁরা, তাঁদের মেয়েরা পর্য্যন্ত, পলিটিক্‌স্ আলোচনা গান শোনার চেয়ে বেশী পসন্দ করেন, তাই বীকহম্ সাহেব অভিমানভরে ফরাসীদেশে চলে যেতে চান। ফরাসী দেশে যাঁরাই গিয়েছেন তাঁরাই বলেন যে ফরাসীজাতি অত্যন্ত সুরপ্রিয় এবং প্যারিস সব বড় ওস্তাদেরই কাশীধাম। আনাতোল ফ্রান্স একজন ফরাসী, এবং তাঁর চেয়ে অন্য কেউ প্যারিস বেশী ভালবাসত না কিংবা চিন্‌ত না; তিনি কিন্তু নিজে লিখেছেন, "We French are not a musical nation and do not readily sing." মোদ্দা কথা এই যে কোন্ জাতি কি-প্রিয় বলা সাহিত্যের কথা—অর্থাৎ বাজে কথা। সমাজতত্ত্ববিদ অবশ্য জাতীয় ভাবধারা নির্দ্দেশ কোরতে লোকের মাথা গোনেন।

তিন প্রকারের মিথ্যা কথা আছে, lies, d-d lies, and statistics— মাথা গুণে দেশের জন্মমৃত্যুর তালিকা, আমদানী-রপ্তানীর হার, মুসলমান এবং অ-মুসলমানদের সংখ্যা ঠিক করা যেতে পারে, কিন্তু একটা গোটা জাতির মনের গতি কি তা বলা যায় না। বলা যাবে না কেন? ভুল হবে এই মাত্র! অবশ্য ভুল বিশ্বাস সমাজের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সকলে যদি সত্য খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে তা হলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, জগৎ আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, দেবদ্বিজ-সম্প্রদায়ের—অর্থাৎ যাঁরা সমাজের রক্ষক তাঁদের খানা-পিনা মারা যায়! আমি ব্রাহ্মণ, বাড়ী আমার ভট্টপল্লীর কাছে, ব্রত আমার অধ্যাপনা, সাধনা আমার অধ্যয়ন, অতএব সত্যানুসন্ধান আমারই ধর্ম্ম। আমার ধর্ম্ম আমাকে বোলছে এই, যেকালে বর্ত্তমানে রবিবাবু এবং অতুলপ্রসাদ বেঁচে রয়েছেন, তখন বাঙ্গালী, সুর ভালবাসুক আর না বাসুক, কবিতাকে ঘৃণা করুক আর না করুক, সঙ্গীত যে ভালবাসে তার ভুল নেই। পিঁপড়ের যেমন শুঁয়া, জাতির তেমনই প্রতিভা। সেই প্রতিভার প্রভাব যতদূর পৌঁছায় ততখানি পর্য্যন্ত দেশ সভ্য হয়। সভ্যতার ধারা প্রতিভাই কেটে চলে।

*   *   *   *

তাঁহারা—আজ আপনার মুখে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে এসেছি। সেদিন সুর থেকে সঙ্গীত পৃথক কোরেছিলেন মনে রাখবেন।

আমি—বেশী পৃথক থাকার পক্ষপাতী আমি কখনও নই, জোর একমাস—তার মধ্যে চারটি মধু শনিবার। সে যাই

হোক্—আলোচনা শোনে না, বক্তৃতা শোনে, এবং আলোচনা করে।

তাঁহারা—সাধারণত, যখন দুটি বিরোধী মতে কিছু সত্য আছে লোকে স্বীকার করে, তখনই লোকে আলোচনা করে। আমরা রবি বাবুর গান—বিশেষত তাঁর পুরাতন গান—এই যেমন 'যামিনী না যেতে, অলি বারবার ফিরে আসে, সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি'—অত্যন্ত ভালবাসি। অতুলপ্রসাদের সব গানই প্রাণস্পর্শী। কিন্তু রবি বাবুর অনেক গান, বিশেষত তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার পর রচিত গানগুলি আমাদের মোটেই ভাল লাগে না, তার চেয়ে থিয়েটারের গান ভাল লাগে, রজনী সেনের গান ভাল লাগে। রবি বাবু বড় কবি, তাঁর দেওয়া সুর ভালও লাগে, অথচ ভাল লাগে না। আপনি কি ভাবে বলেন রবি বাবু সুরের রাজ্যেও মহারাজা ?

আমি—মহারাজা নন্ কেবল, রাজচক্রবর্ত্তী, মহারাজাধিরাজ।

তাঁহারা—বর্দ্ধমান একেবারে! আপনি দেখছি sun-struck by রবি বাবু! আপনি মশায় অত্যন্ত গোঁড়া!

আমি—গোঁড়ামী অনেক সময় দৃঢ় বিশ্বাসের লক্ষণ। ভট্টপল্লীতে এখনও দু'একটি দৃঢ় মনের পরিচয় পাওয়া যায়, যেটির সন্ধান সহরে পাওয়া যায় না—বিশেষত অ-সহযোগ আন্দোলনের পর।

তাঁহারা—গোঁড়ামী ভাল কি মন্দ তর্ক কোরতে আসিনি, তবে যা বুঝছি তা এই যে, ঐ রকম অন্ধ বিশ্বাস এবং গোঁড়ামী নিয়ে তর্ক হয় না, আলোচনা হয় না, সাধু বক্তৃতা হয়। আপনি মঞ্চে উঠুন, আমরা হাঁ কোরে শুনি।

আমি—বক্তৃতা দেওয়া আমার ভাল লাগে। যারা কথা কইতে জানে না তারা যখন art of conversation

সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখে তখনই জিহ্বার চেয়ে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ওপর পড়ে ঝোঁক। এই সব বোবার দলই বলে যে ভাল কইয়ে হতে গেলে মধ্যে মধ্যে চুপ কোরে অন্যের কথা শুনতে হয়। আরে মশাই, সারারাতই ত চুপ কোরে শুনি, তার ক্ষতিপূরণ কোরব না? আর যদি দাম্ভিক না ভাবেন তাহলে বলি, আমি যত আমার বক্তব্যের বিষয়ে ভেবেছি, অন্যে কি তা ভেবেছে? ঐ সব হিংসুটে বোবাদের পরামর্শ নিতে গেলে স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কথাই কওয়া যায় না। আপনারা যেকালে বন্ধু, অন্য কিছু নন্, তখন অবশ্য আপনাদের মধ্যেমধ্যে চুপ কোরে থাকতেই হবে। আপনারা যদি তর্কই করেন, তাহলে বক্তব্যটি বিপথগামী হ'য়ে পড়বে। বক্তৃতার সুবিধা দেখুন, হাতে রইল নোট, মাথায় রইল পয়েন্ট, পয়েন্ট ঠিক থাকলে বক্তব্যটি নিজের লাইন ধরে ষ্টেশনে এসে পৌঁছবে, রাস্তায় মালগাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগবে না। সত্য কথা বোলতে কি, তর্ক জিনিষটা বড়ই তামসিক, বুদ্ধির অহঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই জন্যই স্ত্রীজাতি, যে জাতি অত আত্মবিস্মৃত, অত পরার্থপর, অত ভক্তিমতী, অত—অর্থাৎ যে জাতি অত সাত্ত্বিক—সেই জাতি কখনও তর্ক করেন না, সাধু বক্তৃতা দেন, এবং পুরুষজাতি কেবলই নিজেদের মধ্যে, এবং স্ত্রীজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তর্কই করেন। এই দম্ভের জন্যই পুরুষের আজ পতন হয়েছে—কেউ পরীক্ষায় প্রথম হ'তে পারছেন না। আরো দেখুন—

তাঁহারা—দেখছি যা তা অনেক আগেই বুঝেছি—সিদ্ধান্তের পক্ষে তর্ক ও বক্তৃতা দুইই সমান।

আমি—না, না, তা কেন? বক্তৃতাতে একটু বিশ্বাস দরকার। বক্তার নিজের ওপর আস্থা থাকবে, এবং শ্রোতা

বক্তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হবেন, তবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে। আমার সিদ্ধান্তটি মেনে নিলেই সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা—থুড়ী, বক্তৃতা সুরু করি। সেটি এই যে, প্রকৃত কথোপকথন হচ্ছে সেই দলেই সম্ভব যেখানে একজন মাত্র বক্তা, অন্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ, বিশ্বাসপূর্ণ, অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত শ্রোতা। গোছান কথা শুনতে না ভাল লাগে, বন্ধুর সঙ্গে দেখা কোরবেন না। বক্তৃতার মধ্য দিয়ে গোছান কথা শুনতে গেলে শুদ্ধচিত্ত হওয়া চাই।

তাঁহারা—শুদ্ধচিত্ত কেন ?

আমি—শুদ্ধচিত্ত মানে tabula rasa—মনটি পরিষ্কার শ্লেটের মতন হওয়া চাই। অর্থাৎ বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্ব থেকে কোন মতামত থাকবে না, মনে ভ'রে থাকবে শুধু বক্তার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস, ও শ্রদ্ধা। চিত্তশুদ্ধির পক্ষে ওগুলির একান্ত আবশ্যক, শাস্ত্রেও লিখেছে।

তাঁহারা—বুঝেছি, seance attend করবার সময় যে মনোভাবের প্রয়োজন আপনি তাই চান্। অর্থাৎ রবিবাবুর গান সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার ও ধারণাগুলি ধুয়ে ফেল্লেই আপনার বক্তব্য, অর্থাৎ সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বটি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম কোরতে সক্ষম হব ?

আমি—ঠিক্ কথা। তবে অত সহজে পূর্ব্ব ধারণাগুলিকে দূর করা যায় না, নিজেকে সংস্কৃত করা বড় শক্ত।

তাঁহারা—অর্থাৎ আমাদের সংস্কারের জন্য আপনার বক্তৃতার দরকার। এত ভণিতাও আপনি জানেন! বাজে কথা ক'য়ে রাত কাটালেন! প্রমাণ হল কি ? না, কাউকে শ্রদ্ধা কোরতে হ'লে তাকে শ্রদ্ধা কোরতে হবে! একেবারে begging the question !

আমি—এই নিরন্ন বুভুক্ষু জাতি, যার—Digby পড়েছেন? রাধাকমলের দরিদ্রনারায়ণ পড়েছেন?—পড়বেন মশায় বইখানা—ওটা তাঁর আপেক্ষিক হিসাবে দরিদ্র অবস্থারই লেখা—এক কথায়, এই ভিখারী জাতি, যার নেতারাও ভিখারী, তার একটি নগণ্য ব্যক্তি, যদি স্বরাজ কিম্বা অন্ন ভিক্ষা না ক'রে, সামান্য একটি প্রশ্ন ভিক্ষা করে তা হ'লে কি জাতির মানহানি হয়? বাস্তবিক পক্ষে আমি প্রশ্ন ভিক্ষা করছি না; রবিবাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে পূর্ব্ব হতেই প্রশ্ন ভিক্ষার দ্বারা সঞ্চিত মতামত পোষণ ক'রে আপনারা যে মনের থলী ভরিয়েছেন, সেই থলি উজাড় করুন, তবেই থলির ভেতর সোনাদানা পাবেন—আমার শুধু এই বক্তব্য। রবি বাবুর সম্বন্ধে, তাঁর কবিতা, গদ্য, জীবন নিয়ে আপনারা অনেক কুসংস্কার পোষণ করেন, সেগুলিকে দূর না কোরলে তাঁর সঙ্গীতের যথার্থ মূল্য দেওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব।

তাঁহারা—আমাদের অত কৃপণ ভাববেন না। আমরা প্রস্তুত, কেননা, এতক্ষণ পরে বিষয়টি পরিষ্কার হ'ল। সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। মুখবন্ধ কোরতে আপনি আপনার গুরু বীরবলের মতনই কালক্ষেপণ করেন। গুরু-নিন্দা শুনে রাগ কোরবেন না—আপনার উত্তর আমরা জানি, প্রথমে তর্কের বিষয় সম্বন্ধে মনোভাব ঠিক কোরে নেওয়াই ভাল, এবং সেই মনোভাব পরিষ্কৃত হ'লে সব গোলমালই চুকে যায়। তার পর, আপনার বক্তৃতা সুরু করুন।

আমি—আপনারা ধন্য! একটু ইতিহাস শুনতে হবে।

তাঁহারা—ইতিহাসের জন্যই বিজ্ঞানের ছাত্র হলুম, আবার সেই ইতিহাস! বাড়ীতে জননী বলেন, আগে লক্ষ্মীমন্ত ছিলাম, ঘরে লক্ষ্মী এসে লক্ষ্মীছাড়া হয়েছি, নেতাদের মুখেও সেই কথারই

পুনরাবৃত্তি, আগে সোনার ভারত ছিল, এখন লোহার ভারত হয়েছে! যাই হোক্, বলুন শুনি, 'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে'!

আমি—আমি ওরকম ভাবপ্রবণ ইতিহাস শোনাব না। আপনারা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, আপনাদের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসই শোনাব, এবং মোগলাই ইতিহাস—খানা দিতে পারব না। আমার বর্ণিত ইতিহাস শুনে কিন্তু মনে হবে না, 'হা ভগবান! ভারতবর্ষের কি ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নেই!' শুনুন, আমি ধার্ম্মিক—

তাঁহারা—তাতে ভারতবর্ষের কি আসে যায়?

আমি—তাতে সবই আসে যায়, ভারতবর্ষের যাক্ আর না যাক্! সব কলা-বিদ্যারই গোড়ায় আছে একটি ধর্ম্ম। গোড়াতে ধর্ম্ম-জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এক, জ্ঞান মানে আমি এখন প্রবৃত্তি-মূলক উপলব্ধি বলছি। ধর্ম্মভাবেই সব আর্টের বীজ নিহিত রয়েছে, প্রত্যেক ধর্ম্ম মানুষের মনকে স্বাধীন কোরে দেয়, প্রথম অবস্থায়। যখন ধর্ম্ম 'ধম্মে' পর্য্যবসিত হয়, তখন 'শূন্য' আঁকা আর ভাবা ছাড়া মানুষের অন্য কিছু কর্ত্তব্য থাকে না। দেশে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম শূন্যবাদে এসে উপস্থিত হল, তখন অজন্তার চিত্রকর গুহা ছেড়ে মা কালীর শরণাপন্ন হলেন, ছুটে কালীঘাটে উপস্থিত, পট আঁকতে আরম্ভ ক'রলেন। প্রমাণ এই যে হাতের কাছেই রয়েছে—Indian Art and Letters, Vol 11, No. 2. —অজিত ঘোষের প্রবন্ধটি পড়ে দেখবেন, খাসা লেখা। আর্টের গোড়ায় ধর্ম্ম এ কথা নাস্তিকেও গ্রাহ্য করে—Cllve Bell হচ্ছেন ইংরেজ, এবং Osvald Siren হচ্ছেন সুইডিস্—আমাদের ইব্‌সেনের জাত। তাঁরাও—

তাঁহারা—দয়া কোরে পাণ্ডিত্য দেখাবেন না, আপনি যা বোলবেন বিশ্বাস কোরব। আপনার অনুরোধ সত্ত্বেও যখন ঐ সব কেতাব পড়ছি না, তখন ঐ সব কেতাবে কি কি আছে আপনি যা বোলবেন তাই শিরোধার্য্য কোরে নেবো!

আমি—আপনাদের বিশ্বাসকে ধন্যবাদ। এখন শূন্য যেমন ফাঁকা, শূন্যবাদও তেমনি ফাঁকা। Nature abhors vacuum, অর্থাৎ প্রথম পক্ষ মারা গেলেই দ্বিতীয় পক্ষের আবশ্যক হয়। সেইজন্য শূন্যস্থানে কেষ্ট, বিষ্টু, রামচন্দ্র প্রভৃতি জ্যান্ত নরনারায়ণ এসে অধিষ্ঠিত হলেন। দক্ষিণ দেশে আলোয়ার এবং ভক্ত সম্প্রদায় তামিল গান গেয়ে লোক খেপাতে লাগল—দশম শতাব্দী থেকে মাদ্রাজী খেপ্‌ল। উত্তর ভারতে এই ভক্তির বাণ এসে হাজির হ'ল প্রায় তিন শ' বছর পরে। বাণের পর যে পলিমাটি পড়ে তাইতে জমি উর্ব্বর হয়,—সেই জন্য শিখ, দাতুপন্থী, রাধাবল্লভী (যাঁদের নাম নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে কৃতজ্ঞতা-ভরে স্মরণ করি), বল্লভাচারী, চরণদাসী সম্প্রদায় দেশ ছেয়ে ফেল্‌লে। বাংলা দেশে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চৈতন্য, চণ্ডীদাস এবং তাঁদের দাসানুদাস সকলে মিলে সাহিত্য-সৃষ্টি কোরলেন, নানক পঞ্জাবে, কবীর এই দেশে, নর্সীমেটা গুজরাটে, মীরাবাই রাজপুতনায়, তুকারাম মারহাট্টাদেশে সব ভক্তিরসাত্মক গান রচনা সুরু কোরে দিলেন। শুধু রচনা হল নয়, সেই গান সকলে মিলে তারস্বরে গাইতে লাগল। সেই সব গানের সুর ছিল দেশী, মার্গ নয়, অর্থাৎ বাঙ্গালী গাইতেন কীর্ত্তন, বাউল, এ দেশের লোকেরা গাইতেন ভজন, মারহাট্টারা গাইতেন আভঙ্গ। অন্যধারে আমীর খসরু হিন্দু মার্গ সঙ্গীতের জাত মেরে দিলেন, ফার্সী 'মাক্কাম' দিয়ে। প্রবন্ধ সঙ্গীত খাপ খেয়ে গেল ফার্সী গোরার camp song-এর সঙ্গে।

একধারে নেড়ানেড়ীর, অন্য ধারে যবনের স্পর্শে মার্গ-সঙ্গীত একেবারে জগন্নাথের খিচুড়ী ভোগ হ'য়ে গেল। এমন সময় এলেন রাজা মান তানোয়ার, গোয়ালিয়র নগরে—তিনি ঐ সহরের রাজা, অর্থাৎ কিল্লাদার হলেন, ১৪৮৬ সালে। Willard সাহেব, আবুল ফজল, অধ্যাপক যোশী, Ouseley, ভাতখাণ্ডেজী এঁকেই ধ্রুপদের জন্মদাতা বোলেছেন। এঁর স্ত্রী একজন গুর্জ্জরী রাজপুত্রী। দেখতে পরী, এই টানা-টানা চোখ, আবার সেই চোখের কাল পাতা যেন দেবী চৌধুরাণীর বজরার দাঁড়, ঝপ্ ঝপ্ কোরে পড়ে, ভুরু দুটি উড়ন্ত চিল, গালে টোল্, ঠোঁট টুক্‌টুকে লাল—যেন ফাগে ছোপান ডবল্ ব্র্যাকেট, আর কপালের চুল, যেন ছোট ছোট গোখরো সাপ ফণা তুলে রয়েছে, গোয়ালিয়রের গরম, কপালে এবং কপোলে স্বেদবিন্দু—

তাঁহারা—মশাই—

আমি—চুপ্। নাম আবার মৃগনয়নী—একেবারে রাজ-যোটক, রূপের সঙ্গে নামের চটক! রাজা হ'য়ে পড়লেন স্ত্রৈণ, রাজাও ত মানুষ! রাজা মান একমাত্র স্ত্রীকে ভালবেসে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়লেন—দেশী ও মার্গ সঙ্গীতের মিশ্রিত সঙ্কীর্ণ সুর তারিফ্ কোরতে লাগলেন। কানিংহাম্ সাহেব বোলেছেন যে, রাণী রচনাও কোরতেন, গানও গাইতেন, আর একজন বোলেছেন যে তিনি শুধু রচনা কোরতেন। সে যাই হোক্, রাজা রাণীর নামে সঙ্কীর্ণ সুরের নাম বসালেন, বাহুল গুজরী, মাল্‌গুজরী, মঙ্গল-গুজরী প্রভৃতি। কানিংহাম সাহেবের মত গ্রাহ্য কোরতে বলছি না।

তাঁহারা—তাঁর মত নিশ্চয়ই গ্রাহ্য কোরব। মশাই, আর যে থাকতে পারছি না! আপনি শুধু তর্কের খাতিরে

ইতিহাসের মধ্যে এক সুন্দরী রমণীর অবতারণা কোরলেন, ইতিহাসে তাঁর চেহারা কি রকম ছিল লেখা নেই, আর যদি তাঁকে আনলেনই, তাঁকে গান গাইতে দিচ্ছেন না, অমন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। কানিংহাম্ সাহেব মেয়েদের খাতির জানতেন, মৃগনয়নী নিশ্চয়ই কোকিলকণ্ঠী ছিলেন। আপনি অত্যন্ত অভদ্র ও নিষ্ঠুর।

আমি—নিষ্ঠুর আমি, না সাহেব? ঐ সুন্দরী যদি গান রচনা করার 'পরে আবার গাইতে পারতেন, তা হ'লে আপনাদের কি দশা হত ভাবুন দেখি! অবশ্য ইতিহাসে তাঁর কোন রূপ বর্ণনা নেই। কিন্তু ইতিহাসে কি সুন্দরী রমণীর স্থান থাকবে না, তাঁদের স্থান কি কেবল আপনাদের বাড়ীতেই! এ ত' বড় আশ্চর্য্য কথা! তাঁরা ব্যতীত ইংলণ্ডের ইতিহাসে কেবল Wars of the Roses, ক্রমওয়েলের যুদ্ধ, আর রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব, না আছে দ্বিতীয় চার্লস, না আছে চতুর্থ জর্জ্জ! আচ্ছা, এবার থেকে কেবল বৈজ্ঞানিক ইতিহাসই বোলে যাব।

তাঁহারা—না, না, তা কেন? যখন সৌন্দর্য্য ঐতিহাসিক ঘটনা, আর বিজ্ঞান ঘটনাকে গ্রাহ্য কোরতে বাধ্য, তখন অবশ্য মৃগনয়নীকে শ্রদ্ধা কোরতে হবে।

আমি—বেশ, হেলেনের বয়স ১০৮ বছর হয়েছিল প্রমাণিত হয়েছে ঠিক্ যে সময় প্যারিস ঐ কাণ্ড কোরলেন। Duchess du Barry খাঁদা ছিলেন, Madame Maintenon অত্যন্ত মোটা ছিলেন, ক্লিওপ্যাট্রার রং তামাটে এবং আন্টনীর সঙ্গে দেখা হবার সময় বয়স হয়েছিল অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ। এ সব বৈজ্ঞানিক সত্য, অর্থাৎ ঘটনা।

তাঁহারা—ধুৎ তোর বিজ্ঞান, ধুৎ তোর ঘটনা! তারপর কি হ'ল বলুন?

আমি—রাণী মৃগনয়নীর নয়ন মুদ্রিত হবার পর রাজা মান দেখলেন কিছু কাজ চাই। তিনি বুঝলেন যে একধারে ফার্সী সুর এবং অন্য ধারে দেশী ভক্তিরসাত্মক সুরের আক্রমণে মার্গ সঙ্গীত কৌলিন্য হারিয়ে ফেলেছে। রাজা নিজে ছিলেন মিশ্র ও সঙ্কীর্ণ সুরের ভক্ত, তাই এক সভা ডাকলেন। সেই সভায় ঐ প্রকার মিশ্র সুরের রীতিনীতি ঠিক করা হ'ল। রাজা তবু হাতে কাজ পান না। রাণী বেঁচে থাকতে যে কার্য্য কোরতে ইচ্ছা হয় নি, সময় পান নি, এবং ইচ্ছা হ'লেও যে কাযে মন বসেনি, আজ তাই কোরবেন মনস্থ কোরলেন। তিনি একটা আস্ত বই লিখে ফেললেন। ভগবানের কৃপায়, এই বইখানির ফার্সী তর্জ্জমা রামপুরের নবাব সাহেবের লাইব্রেরীতে আছে—কেউ দেখতে পায় না! রাজা মান বই লিখেই মারা গেলেন। ঠিক এই সময় বড় বড় গাইয়ে দেশে জন্ম নিলেন। সকলেই গোয়ালিয়র থাকতে চান—নায়ক বক্সু, মাপু, ভান্নু, সরযু, ভগবান, ধোঁন্দি, ডালু। প্রথম দু'জন ওস্তাদ গুজরাটে সুলতান বাহাদুরের কাছে আশ্রয় নিলেন। এধারে, অল্পদিন পরে সূর-বংশ বাদসা হ'য়ে বোসলেন—সেই বংশের অবতংস ইসলাম সা' গান শুনতে গোয়ালিয়রে রাজধানী তুলে নিয়ে যান। আদিল সাহের সময় সুরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল,—নিজে বড় ওস্তাদ, তিনি বাজ্ বাহাদুর, সেই বিখ্যাত গায়িকা রূপমতির বাজ্ বাহাদুরকে, এবং তানসেনকে গান শিখিয়েছিলেন। তিনি একটি ছোট ছেলের মধুর গলা শুনে দশ হাজারী মনসব্দার কোরে দেন—অনবরত শিষ্যের বাজখাঁই গলা শুনে বোধ হয়! আদিল

সুরের ছিল সুরেলা দিল, তাই ওয়াজিদ আলির মত রাজ্য হারালেন। রামদাস, সুরদাস, বৈজু, এমন কি তানসেন পর্য্যন্ত এই সময়ের লোক। তাঁরা সব ধ্রুপদ গাইতেন, অর্থাৎ গোয়ালিয়রের চালে সঙ্কীর্ণ সুর গাইতেন, যে সুর দেশী ও ভ্রষ্ট। রাজা মান যে চাল বেঁধে দিয়ে গেলেন এবং আদিল সা ও সমসাময়িক ওস্তাদরা যে চালকে প্রচলিত কোরলেন— তারই নাম ধ্রুপদ।

তাঁহারা—কি প্রমাণিত হ'ল ?

আমি—সবই প্রমাণিত হ'ল। প্রমাণিত হ'ল এই যে, ধ্রুপদ নারদের মুখ থেকে বাহির হয়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় যে সঙ্কীর্ণ সুরকে নিয়মাবদ্ধ করা হয়েছিল তারই নাম ধ্রুপদ, যে ধ্রুপদকে এখন শুদ্ধ সুরের খনি মনে করা হয়, এবং যে ধ্রুপদের দোহাই দিয়ে রবিবাবুর গানকে অশুদ্ধ বলা হয়। চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে ভক্তি অর্থাৎ বৈষ্ণবী ভাব সকলের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার কোরেছিল, ধ্রুপদ সেই ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত রচনা, এবং সেই 'সঙ্গীত' সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যই 'গীত' হইত। আবুল ফজল সাহেব ধ্রুপদকে 'suited to popular tastes' বোলেছেন। এই সময়কার সব ধ্রুপদ রচনাই প্রায় ভক্তিরসাত্মক। তারপর যখন রাজা রাজোয়াড়া, সা' বাদসার দরবারে ধ্রুপদের চলন হ'ল, তখন রাজা-বাদসাই কেষ্টবিষ্টু হ'য়ে উঠলেন। তখন ভগবানের কাছে পেট্রনের, অর্থাৎ মুরুব্বির 'ক্রোর বরষ' পরমায়ু এবং যোজনব্যাপী রাজত্বের পরিধিবৃদ্ধি ভিক্ষা করা, কিংবা সুরের লক্ষণ নিরূপণ করাই ধ্রুপদরচনার বিষয় হ'ল।

তাঁহারা—তা হ'লে মোগলদের আমলে কি কি হ'ল ?

আমি—তাঁদের সময় ফার্সী সুর, দেশী, ও মার্গ সুরের মিশ্রণে এক নতুন ঢংএর সৃষ্টি হ'ল। গোটা কয়েক মল্লার, গোটা কয়েক টোড়ী, এক-আধটা সারং, এক-আধটা কানাড়া তৈরী হ'ল। দরবারী টোড়ী, কিংবা দরবারী কানাড়া নয়, সেগুলি শুদ্ধ টোড়ী এবং শুদ্ধ কানাড়া, অর্থাৎ সনাতনী টোড়ী এবং কানাড়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। এক কথায় ব'লতে গেলে, স্বরের ক্ষেত্রে কোমল গান্ধারের ওপর খানিকটা ঝোঁক দেওয়া হ'ল। তখনও সুরের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল—এক এক ওস্তাদ গলার জোরে স্বকৃতভঙ্গ সুর চালাতে লাগলেন—যেমন বিলাস খাঁ চালালেন বিলাস খাঁনী টোড়ী, তীব্র মধ্যমের ওপর কোমল মধ্যম চাপিয়ে। মার্গ অর্থাৎ পুরাতন দেবতাদের সুর দক্ষিণে আটক পড়ল, এবং উত্তর ভারতে ধ্রুপদের সঙ্গে অন্য চালও চলতে লাগল, তবে ধ্রুপদ হ'ল primus inter pares,—রাজাদের মধ্যে নল রাজা। আবুল ফজল সাহেব এই কয়টি প্রচলিত চালের উল্লেখ কোরেছেন, সব মনে নেই, তবে ধ্রুপদ, আগ্রা-গোয়ালিয়রে, সিন্ধু, সিন্ধুদেশে, ধ্রুব, তেলিঙ্গানায়, বাঙ্গালী, বাংলা দেশে, জৌনপুরে চ্যুতকলা, বিষ্ণুপদ মথুরায়, লচ্ছারী দ্বারভাঙ্গায়। গান্ধারী উত্তর-পশ্চিমে, সৌরাষ্ট্রী, সুরটে, মারোঁয়া-মন্দ, রাজপুতনায়, এবং গুর্জ্জরী গুজরাটে ত' আগে থাকতেই ছিল। এর থেকে কি প্রমাণ হয় না, যেমন জাতিতত্ত্বে, সমাজতত্ত্বে প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে, যে যখন মানবের একটি কোন জীবন-ধারা লুপ্ত হ'তে বসে, তখন বিদেশী কিম্বা দেশের মাটির শক্তি এসে সেই সনাতন ধারাকে প্রাণবন্ত করে ? এখন যে ধ্রুপদকে আমরা শুদ্ধ সঙ্গীত বলি সেটি একটি জংলা সুর,

গোয়ালিয়র-আগ্রা অঞ্চলের লোকসঙ্গীত, না হয়, বিদেশী ফার্সী সুরের সঙ্গে দেশী মাটির সুরের মিশ্রণের ফল; তার কাঠামো হয়ত মার্গ সঙ্গীতের, তাও সম্ভবত নয়, মার্গ সঙ্গীতের কনকাঙ্গী ঠাট কিছু আগেই বদলে গিয়েছিল। আগেকারের ওস্তাদরা যে দেশী সুরকে ঘৃণা কোরতেন না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, দুপুর বেলায় 'দেশী' সুরের ধ্রুপদ এখনও গাওয়া হয়, এবং দেশী টোড়ীতে আমি অনেক পাকা ধ্রুপদ শুনেছি। ঠাট পরিবর্ত্তনের পর মোগলদের আমলে সময় অনুসারে সুরের ভাগ হ'ল, এবং প্রত্যেক রাগরাগিণীর ছবি তৈরী আরম্ভ হ'ল। পুণ্ডরীক নামে এক দক্ষিণী পণ্ডিত কালভেদে সুর ভাগ কোরলেন। এই ঘটনা থেকে সন্দেহ হয় যে, তাঁর পূর্ব্ব হ'তেই লোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সুর গাইত। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, মোগল আমলের পণ্ডিতেরা কেউ শ্রুতি মানতেন না, কেবল বারটি স্বরই স্বীকার কোরতেন।

তাঁহারা—মোগলদের পর কি হ'ল?

আমি—পরবর্ত্তী সঙ্গীতের ইতিহাস, উত্তর ভারতে অবশ্য, অহিন্দু ও অশাস্ত্রীয়। ধ্রুপদের পূর্ব্ব হ'তেই খেয়ালের আদর ছিল। প্রমথ চৌধুরীর 'খেয়ালের জন্ম' ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু মহম্মদ সা' রঙ্গীলের সময়ই সদারঙ্গ এবং অধারঙ্গ খেয়ালকে রাজদরবারে এনে হাজির কোরলেন। সেই খেয়াল দুই রকম হ'য়ে গেল, যেমন এ দেশে এবং বিলাতে লিবারেল পন্থীদের অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, কেউ হচ্ছেন পুরাতন-পন্থী, আর কেউ চরম-পন্থী, বিপ্লববাদী—অর্থাৎ এক রকম খেয়াল ধ্রুপদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন কোরলে, যেমন হর্দ্দু খাঁ, তাজখাঁ, আলি বক্সের ঘরোয়ানা—বেহালার বামাচরণবাবু যেমন ভাবে খেয়াল গান; অন্য রকম

খেয়াল টপ্পা-ঠুংরীতে পরিণত হ'ল, কিংবা মিশে গেল, এই যেমন সুরেন মজুমদারের গান। টপ্পা পঞ্জাবে এবং ঠুংরী লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীতে প্রচলিত হ'ল। আজকাল সে ঠাট পর্য্যন্ত বদলে গিয়েছে। কাফিঠাট এখন বেলাওলঠাটে এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ সব শুদ্ধস্বরই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে মূলঠাট হিসাবে। এই হ'ল উত্তর-ভারতীয় দরবারী সুরের ধারা। এখন যদি শুদ্ধ সুরে গাইতে হয়, তা হ'লে ধ্রুপদ খেয়ালকে বর্জ্জন কোরতে হবে, শ্রুতির ব্যবহার কোরতে হবে, শুদ্ধ স্বর পরিত্যাগ কোরতে হবে, এবং মাদ্রাজীদের মতন কনকাঙ্গী কিংবা কাফী ঠাটেই গাইতে হবে।

তাঁহারা—মশাই, হিসাব বিভাগে মাদ্রাজীদের পাল্লায় পড়ে উত্যক্ত হয়েছি, গান শুনে একটু আনন্দ পাই, তাও মাদ্রাজী ওস্তাদ এনে আমাদের আনন্দ নষ্ট কোরতে চান না কি? গান, সুর হ'তে পারে, সঙ্গীত হ'তে পারে, কবিতা হ'তে পারে, কিন্তু কান্না নয় আমরা হলফ্ কোরে বোলতে পারি। মাদ্রাজী ঠাট শুদ্ধ হোক আর না হোক, আমরা বাঙ্গালী, আমাদের অশুদ্ধ ঠাটেই কাজ চলবে। শুনেছি জাতি হিসেবেও আমরা খিচুড়ী, না হয় সুরও আমাদের জংলা হোক্!

আমি—লক্ষ্মী ছেলেটির মতন এই কথা গোড়ায় মেনে নিলেই হ'ত!

তাঁহারা—তা হ'লে বক্তৃতা দিতেন কি নিয়ে?

আমি—আমার কাছে বক্তৃতা দেবার অনেক বিষয় আছে। এইবার আমার বক্তব্য শেষ করি। রাজা মানের সময় থেকে সাজাহানের সময় পর্য্যন্ত, দু'শ বছর ধরে সুরে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, এবং তার পর গত দু'শ বছর ধ'রে

যে সুরসৃষ্টির ধারা, গায়কী-ধারা নয়, জাতীয় নিরানন্দের মধ্যে আত্মগোপন কোরেছিল, সেই ধারা আজ গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে বাংলা দেশে স্রোতস্বিনী হ'য়ে উঠেছে। ওয়াজিদ আলি সা' মেটেবুরুজে যখন গেলেন তখন লক্ষ্ণৌএর প্রজা হাহাকার কোরেছিল, কিন্তু বাঙ্গালী তাঁকে বুকে কোরে নিলে। তাঁর পূর্ব্বেও বিষ্ণুপুর, বেথিয়া, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, মুর্শীদাবাদ, ঢাকা অঞ্চলে গানের আদর ছিল বটে, কিন্তু মেটেবুরুজ থেকেই বর্ত্তমান বাংলা দেশে হিন্দুস্থানী অর্থাৎ মুসলমান ওস্তাদের গায়কী চাল প্রচলিত হয়। বিষ্ণুপুরী চাল ঠিক মুসলমানী চাল নয়, ও চালটি বেহারের। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর নিজের বাড়ীতে বড় বড় মুসলমান ও হিন্দু গাইয়ে-বাজিয়ে এনে পুষলেন। ক্ষেত্র গোস্বামী, যদু ভট্ট, নুলো গোপাল, কালীপ্রসন্ন—এঁরা প্রত্যেকেই ঠাকুরবাড়ীর মুসলমান ওস্তাদদের কাছে ঋণী। রাধিকা গোস্বামী, অঘোর চক্রবর্ত্তীও ঠিক বিষ্ণুপুরী চালে গাইতেন না। এখন রবিবাবু যখন ছেলে মানুষ, তখন বাংলা দেশে দরবারী সঙ্গীতের মধ্যে কেবল ধ্রুপদ এবং তাজ খাঁনী খেয়াল কিংবা আলীবক্‌সী খেয়াল গাওয়া হ'ত, সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরী ঘরেরও আদর ছিল। এই সব ঘরোয়ানা-সুর ভেঙ্গে কিংবা হিন্দুস্থানী কথার বদলে বাংলা কথা বসিয়ে ব্রাহ্মসঙ্গীত ও যাত্রা-সঙ্গীত গাওয়া হ'ত। পাখোয়াজে গোলাম আব্বাসের ঘরের শিষ্য ছিলেন নিতাই ও নিমাই চক্রবর্ত্তী, তাঁদের শিষ্য হলেন মুরারী গুপ্ত ও সার রমেশ মিত্রের ভাই কেশব মিত্র। লোকে বলে ঢাকা সহরের বরাবরই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা ঠিক বৈশিষ্ট্য নয়। পূর্ব্বাঞ্চলের জমীদার সম্প্রদায় বরাবরই বড় বড় মুসলমান গাইয়ে-বাজিয়ে মাইনে

দিয়ে রাখতেন। হিন্দুস্থানী গায়কী পদ্ধতিতে তাঁরা বেশ পোক্ত হ'য়ে ওঠেন। ও-ধারে আবার ত্রিপুরার মহারাজাও এই পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতের শেষ রবাবী কাসেম আলি খাঁ ত্রিপুরায় ছিলেন। মোট কথা এই যে, সবে পঞ্চাশ-ষাট্ বছর আগেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলায় হিন্দুস্থানী চালকে, বিশেষত ধ্রুপদকে, লোকে বরণ কোরে নিয়েছিল। একধারে তানপূরা অন্য ধারে পাখোয়াজ, অতএব দ্বিজেন্দ্রলালের এবং রবিবাবুর বাল্যকালে ধ্রুপদ-প্রীতি খুবই স্বাভাবিক। দ্বিজুবাবুর কথা ছেড়ে দিচ্ছি। রবিবাবু ছেলেবেলায় যদু ভট্টের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন জানেন বোধ হয়? তার পর গোঁসাইজী আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গায়ক নিযুক্ত হলেন। এই জন্য রবিবাবুর আগেকার অনেক গানে মুসলমানী চালের আমেজ্ আছে। অতুলপ্রসাদের গানে খুব বেশী, তবে সে আমেজ্ ঠিক ধ্রুপদের নয়, কারণ ছেলেবেলায় তিনি ঢাকায় ছিলেন, সেখানে মুসলমান গায়কই বেশী ছিল, তবে পাখোয়াজের চেয়ে তবলার আদরই বেশী ছিল। আগ্রার অধিবাসী 'কত কাল পরে বল ভারত রে' প্রভৃতি ঠুংরী গানের রচয়িতা গোবিন্দ রায় এবং তাঁর পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রদের মুখ থেকে ভাল মুসলমানী চালের গান, বিশেষ কোরে ঠুংরী গান শুনে অতুলপ্রসাদ ছেলেবেলা থেকেই ঠুংরী গানের ভক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। রবিবাবু যেমন গ্রামে গ্রামে বাউল কীর্ত্তন শুনতেন, অতুলপ্রসাদও ছেলেবেলায় বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্ত্তন শুনতে ভালবাসতেন। তারপর অতুলপ্রসাদের লক্ষ্মৌ-প্রবাস আজ বিশ বৎসর অতিক্রম কোরেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল—

তাঁহারা—আজ ওঁদের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবল রবিবাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে বলুন।

আমি—ঠিক বোলেছেন, রবিবাবুকেই ধরা যাক্। এক পেলে বহু'র সাধ মেটে। রবিবাবুর গানে তিন-চারটি স্তর আছে। প্রথম ব্রাহ্ম সঙ্গীতের যুগ, এখন যতু ভট্ট, রাধিকা বাবুর মুখে ভাল ধ্রুপদ শুনে হিন্দুস্থানী কথার বদলে বাংলা কথা বসানই তাঁর কায, যেমন 'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি' 'মন্দিরে মম কে'; এই গানগুলি হিন্দুস্থানী সুরের তর্জ্জমা। দ্বিতীয় যুগে তিনি কথায় ভাল ভাল সুর বসাচ্ছেন, যেমন 'ঝর ঝর বরিষে বারি ধারা,' 'রিম ঝিম ঘন ঘনরে' প্রভৃতি গান; এখন তিনি হিন্দুস্থানী সুরের কাঠামোটি বজায় রেখে experiment কোরছেন, সুরগুলি মিশ্র হ'য়ে যাচ্ছে; এই সময়ের গানগুলি সকলেরই ভাল লাগে। তৃতীয় যুগে তিনি সঙ্গীত রচনা কোরলেন, এই সময় আপনাদের মতে বেখাপ্পা মিশ্র জংলা সুর তৈরী হ'ল, বাহারের সঙ্গে মল্লার মিশল, ভৈরবীর সঙ্গে খাম্বাজ, বেহাগের সঙ্গে কেদারা মিশল। এর পরের যুগ এখনও চলছে, সেটি বাউল কীর্ত্তনের যুগ, এর প্রথম স্তরে শুধু বাউল, ও দ্বিতীয় স্তরে হিন্দুস্থানী কাঠামোর ভিতর বাউলের প্রাণ প্রতিষ্ঠান; তৃতীয় স্তরে একেবারে নতুন সৃষ্টি! এখন মিশ্রণকে আপনারা যদি পাপ বিবেচনা না করেন, অর্থাৎ ইতিহাসকে যদি খাতির করেন, যা আপনারা আমার ওপর নিতান্ত কৃপাপরবশ হ'য়ে কোরেছেন, তা হ'লে এই শেষ যুগের সঙ্গীতকে শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ কোরতেই হবে। মিশ্রণই হচ্ছে সঙ্গীতের ধারা, এবং genius compresses the accomplishment of years into an hour-glass—। রবিবাবুর সঙ্গীত-প্রতিভা না মেনে শুধু তাঁর সঙ্গীতকেই যদি ধরেন তা হ'লেও জীবতত্ত্বের বচন মানতে হবে যে, ontogenesis হচ্চে

phylogenesis-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; অর্থাৎ বানর থেকে মানুষের ইতিহাসও যা, বীজ হ'তে ব্যক্তির ইতিহাসও তা, তবে অল্পকালের মধ্যে। অবশ্য গান পুরোপুরি দেহের কথা নয় মানি, কিন্তু দেহতত্ত্বের তুলনা দিলাম মনস্তত্ত্ব বোঝার সুবিধার জন্য। একটি প্রধানত জড় কিম্বা প্রাণময় জগতের তথ্য, অন্যটি প্রধানত আনন্দময় জগতের সৃষ্টির বর্ণনা।

তাঁহারা। মিশ্রণ হয় মানি, রবিবাবুর প্রতিভা স্বীকার করি, আমরা ওস্তাদ নই তাও জানি, কিন্তু যা হচ্ছে তাই হওয়া উচিত বলি কি কোরে?

আমি। 'আপনাদের কে বোলতে অনুরোধ কোরছে! যা হচ্ছে তাই হওয়া উচিত মানতে গেলে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জগৎ এবং একটি মৎলব-বাজ ভগবান মানতে হয়। পৃথিবীটা দাবার ছক্ নয়, আবার কেবলমাত্র জীবনীশক্তির অবাধ গতিও নয় যে, ভগবানের মৎলবে কিংবা জীবনীশক্তির দুর্ব্বার গতির জোরে যা হচ্ছে তাই হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মানতে হবে। মৎলব আপনার, আমার, প্রত্যেকের, এবং অন্ধ জীবনীশক্তিকে পরিচালিত করি, সচেতন করি আপনি ও আমি, প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি। অতএব মিশ্রণ হওয়া উচিত কি না, কিম্বা কতটা মিশ্রণ হ'লে আমাদের ভাল লাগবে ও ভাল লাগা উচিত, এসব ঠিক কোরবে আপনার আমার কান। সেই কান সুরে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

তাঁহারা। শিক্ষিত মানে কি?

আমি। দশ বছর ওস্তাদী গান শিখলে কি শুনলে কান শিক্ষিত হ'তে পারে, নাও পারে। গোড়া থেকে মনকে সজাগ ও সচেতন না রাখলে সঙ্গীত শিক্ষা pedantry হ'য়ে যায়।

মনকে সজাগ রাখতে হয় কান ও স্বরের ওপর চৌকিদারী করবার জন্য। প্রাণ কিংবা দরদের কথা এখানে ওঠে না। কানের শিক্ষা প্রাণের শিক্ষা নয়, প্রাণের আবার শিক্ষা কি?

তাঁহারা। তা হ'লে—!

আমি। তা হ'লে আবার কি? সে দিন ত দরদ কথাটির মানে যা বুঝি তা বলেছি। রবিবাবুর সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এ নয় যে, সে সঙ্গীতে দরদ আছে। দরদ দেখাবেন গায়ক। রচয়িতা স্বরের মালা গেঁথে সুরই সৃষ্টি কোরেছেন। সুরসৃষ্টির তরফে রবিবাবুর বিপক্ষে আপত্তি এই যে, তিনি সুরকে বিকৃত কোরেছেন বাদী স্বরকে না শ্রদ্ধা কোরে, অনুবাদীকে বাদী কোরে, এবং বিবাদী স্বরকে প্রকট কোরে। এই যেমন ভৈরবীতে তিনি শুদ্ধ রে ও কোমল রে দুইই ব্যবহার করেন, কোমল গান্ধার শুদ্ধ গান্ধার, কোমল ও শুদ্ধ ধৈবত, কোমল ও শুদ্ধ নিখাদ সবই লাগান। এতে আপত্তি কি? ঠুংরীতে সবই লাগে, অনেক ওস্তাদও তানের সময় সব কার্য্যই ক'রে থাকেন। ও আপত্তি হচ্ছে begging the question মাত্র। রবিবাবু ভৈরবীতে ঐ সব বেপর্দ্দা ব্যবহার কোরেছেন বলবার কি অধিকার আছে আপনাদের? তিনি কি গানের মাথায় স্বাক্ষর দিয়ে লিখে দিয়েছেন 'ভৈরবী'? আর যদি দিতেনও, তা হ'লে প্রমাণ হ'ত যে তিনি সুরের নাম জানেন না—সে ভুলে সঙ্গীতের কি ক্ষতি হ'ত? তবে যদি আপনারা বলেন, 'ঐ সুরে ভৈরবীর ছায়া রয়েছে, অতএব ভৈরবীর কায়াকে প্রত্যাশা করছিলাম,' তার উত্তর আমি দেব—'আমাদের অনেক সুরেই অন্য সুরের ছায়া পড়ে। মেঘমঞ্জরী শুনেছেন? বুঝতেই পারবেন না, ললিত, কি বসন্ত, কি বাঙ্গালী। আপনারা কোরবেন ভুল

প্রত্যাশা, আর সেটি না পূরণ হ'লেই আর্টিষ্টের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন! আপনারা যদি রাজ-কন্যা চেয়ে বসেন? এ রকম আবদার ছাত্র-বয়সেই শোভা পায়, এই যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছে বড় অফিসের বড় চাকরী, নেহাৎ না হয় বড়লোক শ্বশুর চাওয়া! পরিচিত কিম্বা প্রত্যাশিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া দূতীর কাজ হ'তে পারে, আর্টিষ্টের নয়। গানে realism হয় না, যদি হ'ত তা হ'লে পাখীর ডাক এবং সমুদ্র-গর্জ্জনের অনুকরণই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত হ'ত।'

রবিবাবুর গানের বিপক্ষে সুর হিসাবে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, তিনি সঞ্চারীতে surprise note বসান, যেটি এমন একটি সুরের বাদী কিংবা অনুবাদী স্বর, যার সঙ্গে আস্থায়ীর সুরের মিশ খায় না—এই যেমন 'একলা ঘরে বসে বসে কি সুর বাজালে' গানটির কেদারা সুর, হঠাৎ দ্বিতীয় পদে তিনি বাউল এনে ফেল্লেন। 'তুমি কোন পথে যে এলে' গানটি বাউল, হঠাৎ আভোগীতে কোমল ধৈবত এবং অন্তরায় তারার কোমল গান্ধার এল। 'কবে তুমি আসবে' গানটিও বাউল। 'শুকনো ফুলের পাতা দুটি পড়তেছে খসে' লাইনটিতে পঞ্চম ও কোমল ধৈবতের মজা রয়েছে, তারপর 'আ···আ···র সময় নাহিরে' লাইনটি বাউল রইল না, হ'য়ে গেল কালাংড়া কিম্বা রামকেলীর মা পা ধ্ব পা মা গা মা ন্বি ধ্ব পা—কি মজা হ'ল ভাবুন দেখি। 'ধীরে বন্ধু ধীরে' গানটিতে প্রায় ১২টি স্বরই লাগছে—ওস্তাদের ভাষায় সুরটি মূলতান ও টোড়ী মেশান, মূলতানের কোমল রে, কোমল গান্ধার, তীব্র মধ্যম, কোমল ধৈবত, তার ওপর বাংলা টোড়ীর কোমল নিখাদ। হায় হায়, কি কাণ্ড হ'ল ভাবুন! ফাল্গুনীতে যদি কবির মুখে ঐ গানটি শুনে থাকেন, কিংবা

দিনুবাবুর মুখে যদি গানটি শুনে থাকেন, তা হ'লে মিশ্র সুরটিকে ভক্তি না কোরে থাকতেই পারবেন না। শুদ্ধ টোড়ীর সঙ্গে ললিতের শুদ্ধ মধ্যম মিশিয়ে যদি বিলাসখানী টোড়ী হয়, তা হ'লে 'ধীরে বন্ধু ধীরে' কেন ঠাকুরী টোড়ী হবে না? আমার স্থির বিশ্বাস যে, কবি এমন কোন সুরের সঙ্গে এমন কোন প্রতিকূল অর্থাৎ বেখাপ্পা সুর মেশান নি, যার ফলে সঙ্গীত অশ্রাব্য হ'য়ে উঠেছে। বেহাগের সঙ্গে কেদারা খাপ খায়, কেননা দুই সুরেই শুদ্ধ এবং তীব্র মধ্যমের কাজ রয়েছে, এবং বাকী স্বরগুলি বিকৃত নয়। মূলতানের সঙ্গে টোড়ীর মিল খুবই রয়েছে—তফাৎ আরোহী, অবরোহীতে, এবং বাঙ্গালী ওস্তাদের মতে কোমল নিখাদে। শাস্ত্রমত মূলতান গাইবার সময় অবরোহীতে শুদ্ধ নিখাদ থেকে কোমল ধৈবতে নামতে হয়, কিন্তু সে সময় বড় বড় ওস্তাদও এমন একটি নিখাদ ব্যবহার করেন যেটি না শুদ্ধ না কোমল। ওস্তাদে সব কার্য্যই কোরে থাকেন —তাঁদের সাতখুন মাপ,—কেননা তাঁরা বিশ বছর ধরে সার্গমই সেধেছেন। রবিবাবু ওস্তাদ নন্, কিন্তু কবি ও আর্টিষ্ট, অনেক ভাল গাইয়ে বাজিয়ের কাছে কান ও মন সজাগ রেখেই গান-বাজনা শুনেছেন, এবং গান-বাজনা সত্যই ভালবাসেন বোধ হয় স্বীকার কোরবেন। তিনি যে ইমনের সঙ্গে ভৈরবী মিশিয়ে, কিম্বা পর পর শুদ্ধ ও কোমল পর্দ্দা লাগিয়ে sin against taste কোরবেন তা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি অ-সাধারণ, তার মানে সাধারণের কান ত' তাঁর আছেই, উপরন্তু আরো কিছু তাঁর আছে।

তৃতীয় আপত্তি তাঁর গানের চালে। তাঁর গানের চাল হর্দ্দু খাঁর চাল নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বর-সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে

অর্থ-সঙ্গীতের চাল কি প্রকার হয়েছে স্মরণ রাখলেই দেখা যাবে যে রবিবাবুর গানের চাল অত্যন্ত মধুর। স্বর-সঙ্গীতের style নির্ভর করে গায়কের ওপর, উচ্চারণের ওপর, তালের ওপর, ধরবার ও ছাড়বার ওপর। আপনারা স্বীকার কোরবেন কিনা জানিনা, কথা হিসাবে রবিবাবু সোরী মিঞার চেয়ে অন্তত কিছু বড়। রবিবাবুর চাল বুঝতে হ'লে তাঁর নিজের মুখে কিংবা দিনেন্দ্রবাবু, সাহানা দেবী, চিত্রলেখা দেবী এবং রমা দেবীর মুখেই শুনতে হয়। অন্যান্য ছেলে মেয়েরা যে তাঁর গানের সর্ব্বনাশ করে, এ কথা বলাই বাহুল্য। সাধারণে হর্দ্দু খাঁর ঘরোয়ানা style নিয়েও যে সর্ব্বনাশ করে না বোলতে পারেন? অপকর্ম্ম করবার স্বাধীনতা এ যুগে আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু এই যুগ কি আমাদের এমন কোন অধিকার দিয়েছে যে, ভক্তের দোষ গুরুর ঘাড়েই ফেলতে হবে? গান গাওয়া চৌরীচওরা নয়। যতদিন অবশ্য পুরুষেরা মেয়েদের নাকী সুরের ন্যাকামী পসন্দ কোরতে থাকবেন, ততদিন রবিবাবুর গান গাইবার অক্ষমতা মেয়েদের রূপ এবং রৌপ্যের ক্ষতিপূরণই কোরতে থাকবে। কোন্ আর্ট আগে কি ছিল জানি না, তবে কোন আর্ট যদি পুরুষ ও স্ত্রীর মনো-হরণের অস্ত্র হয়, তা হ'লে সেটি আর্ট থাকে না জানি—কেননা আর্টের কোন প্রকার দুরভিসন্ধি নেই।

রবিবাবুর গানের বিপক্ষে সাধারণের আর এক ভীষণ আপত্তি এই যে, তাঁর সঙ্গীতে তাল নেই। কথাটা তলিয়ে দেখুন। তালে গাওয়া হয়, আর ছন্দে গান রচিত হয়। অতএব সঙ্গীতে তাল নেই বলা মূর্খতা। আমাদের দেশের কথা বলছি। অন্য দেশের রচয়িতা গানের

স্বরলিপি কোরে থাকেন, যাঁরা গানের কবিতা লেখেন তাঁরা সাধারণত স্বরলিপি তৈরী করেন না, আর যাঁরা স্বরলিপি লেখেন তাঁরা সাধারণত অন্যের লেখা কবিতাই ব্যবহার করেন। যন্ত্র-সঙ্গীতে অবশ্য কবিতার আবশ্যক নেই। রবিবাবুর কবিতায় ছন্দপতন দেখেছেন না কি? দিনুবাবুর স্বরলিপিতে তালের অভাব লক্ষ্য কোরেছেন না কি? তাল সম্বন্ধে অন্য কথা এই যে, সাধারণত রবিবাবুর গান জলদ একতালা, ঝাঁপতাল, তেওরা, কিংবা কাওয়ালী, ঢিমে তেতালাতেই গাওয়া হয়। ধরা যাক্, রবিবাবু ব্রহ্মতাল ও রুদ্রতাল জানেন না, ধামার, আড়া চৌতাল তাঁর গানে নেই, তাঁর ভক্তবৃন্দও ঐ সব তাল সম্বন্ধে মূর্খ। আপনারা ত' সব ঐ তাল সম্বন্ধে পণ্ডিত! অতএব আপনারাই শুদ্ধ কোরে তাঁর প্রদত্ত সোজা তালেই গান না! আপত্তি কি? সুরে তাল নেই, কিন্তু গায়কের গলায় ত' আছে! অতএব রবিবাবু যদি ভুল করেন, আপনারাই ঠিক কোরে গান না! অবশ্য এ কথা মানতেই হবে যে, তাল সম্বন্ধে আপনাদের স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কেননা, সেটি সঙ্গীতের ছন্দের ওপরই নির্ভর কোরছে। কি জানেন, অত বড় ছন্দের ওস্তাদ সাধারণের অপেক্ষা লয় ও তাল বেশী বোঝেন স্বীকার করাই ভাল। আমার আর একটি বক্তব্য আছে—ধরুন তাঁর সঙ্গীতে, দিনুবাবুর গলাতেও তাল ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন যে সুরের তাল এক রকম, কবিতার ছন্দ অন্য প্রকার। সুরকে যে কোন তালেই গাওয়া যায়, তার নিজস্ব কোন তাল নেই, কিন্তু সঙ্গীত তার কথার ভাব অনুসারে ছন্দে বাঁধা। সঙ্গীতে তাল অপেক্ষা লয়ই বেশী প্রয়োজনীয়। তাও ধ্রুপদে আভোগীর লয় অন্তরার লয়ের চেয়ে দ্রুততর হয়,

চতুরঙ্গে ত হয়ই। রবিবাবুর সঙ্গীত লয়ভ্রষ্ট হয় না, কেন না, তাঁর সঙ্গীত কবিতা হিসাবেও খুব বড়। সঙ্গীতে তাল ভ্রষ্ট হবার কিছু স্বাধীনতা আছে, যেটি কবিতায় নেই। সঙ্গীতে তালভ্রষ্টতার সীমা লয়ই নির্দ্ধার্য্য করে। কি জানেন, তাল, লয়, ছন্দের গোড়ার কথা দম্, নিশ্বাস, প্রশ্বাস। কণ্ঠনালীর নিয়মের ব্যতিক্রম হ'লেই কণ্ঠ সঙ্গীতের সর্ব্বনাশ হয়। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গীতে ঐ ধরণের ব্যতিক্রম যে হয় নি তার প্রমাণ পাবেন যদি তাঁর গানের শুধু আবৃত্তিই শোনেন।

তাঁহারা—তর্কটি ক্রমেই দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে উঠছে। আমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়ে জেতা খুব শক্ত কথা নয়।

আমি—আমার দুর্ভাগ্য যে আপনারা এত সহজ জিনিষটি বুঝতে পারছেন না। উত্তরার পাতায় দিলীপ কুমার গোটা কয়েক দামী কথা বোলেছিল, পড়ে দেখবেন, তা হ'লেই বুঝবেন। এক কথায় আমার বক্তব্য এই যে, সুরে বসান কবিতা অর্থাৎ dramatised music, স্বর-সঙ্গীত অর্থাৎ সুর, এবং অর্থ-সঙ্গীত অর্থাৎ সঙ্গীতকে যখন আলাদা আলাদা কোরেছেন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য তালও বিভিন্ন হওয়া উচিত মানতে হবে; যদিও লয়ভ্রষ্ট হওয়া সবক্ষেত্রেই sin against the Holy Ghost। কীর্ত্তনে এমন তাল আছে যেগুলি ধ্রুপদে ব্যবহৃত হয় না, বাউলে গোটাকয়েক সোজা তালই প্রশস্ত, ঠুংরী গানে সাধারণত ঠুংরী দাদ্‌রা তালই প্রযোজ্য, খেমটা গানে খেমটা তালই প্রসিদ্ধ, কাজরী গানে সাধারণত দাদরা কিম্বা কাহারোয়াই চলে,—যেমন হোরিতে ধামার এবং ধ্রুপদে চৌতাল। কীর্ত্তন, কি বাংলা দেশে কি মাদ্রাজে, ঠুংরী, কি দিল্লীতে কি লক্ষ্ণৌএ, কাজরী, কি মির্জ্জাপুরে কি কাশীতে সর্ব্বক্ষেত্রেই অর্থসঙ্গীত;

এবং সেই অর্থসঙ্গীতে যখন কথার তান তোলা হয় তখন বাঁয়া-তবলা চুপ কোরে থাকে। অতএব রবিবাবুর গানে যদি তবল্‌চীকে একটু চুপ কোরতে অনুরোধ করা হয়, তা হ'লে তাঁকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে—এ রকম অভিযোগের কি অভিমানের কারণ নেই। অবশ্য কোন অভিমানেরই কারণ থাকে না। কি জানেন, যার যা তার তা, মুড়ীর সঙ্গে সরষের তেলই ভাল লাগে, গোটাই ভাল লাগে, ঘিও নয়, আর sauceও নয়।

তাঁহারা।—মশাই মুড়ী খাওয়াতে পারেন? তর্ক অনেক দূর গড়িয়েছে। রাত যে ঢ'লে পড়ল! কিছু জলযোগ!

আমি—নিশ্চয়ই। কাশী থেকে মুড়ী এসেছে। বিশুদ্ধ মুড়ী। তবে গোটা নেই।

তাঁহারা—তা আর কি করা যাবে! মধুর অভাবে গুড়, অর্থাৎ একটু sauce দিন, আপনারা সাহেব হ'য়ে পড়েছেন এই দুঃখ! যাই হোক্, রবিবাবুর বিপক্ষে এমন অপত্তি নিজেই তুললেন যার উত্তর নিজেই দিতে পারেন। বাহাদুরী আছে!

আমি—তর্কের রীতিই তাই। শঙ্করাচার্য্যও তাঁর বেদান্ত-ভাষ্যে আমার রীতি অবলম্বন কোরেছেন। অতএব আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আপত্তিখণ্ডনের পর ও-কথা শোভা পায় না। আপনারাই পূর্ব্ব হ'তে আপত্তি তুললেন না কেন?

তাঁহারা—দেখুন আপনি অত্যন্ত দাম্ভিক! এখন একটু ধানি লঙ্কা আনতে বলুন।

আমি—শেষ কথা আপনারাই বোলেছেন। আমি বরাবরই অন্যকে শেষ কথা কইতে দিই।

চতুর্থ স্তবক—মনের কথা

তাঁরা আজ অনেকদিন পরে এসেছেন। তাঁদের কি দিয়ে তুষিব, পূজিব ভেবে উঠতে পারছিনা। গায়ে খদ্দরের কোর্ত্তা, পরণে খদ্দরের আটহাতি ধুতি, পায়ে চাপ্‌লী, মাথায় গান্ধী টুপি, তার ওপর আবার স্বরাজপতাকা অঙ্কিত রয়েছে। সিগারেট দেওয়া দূরে থাকুক, চা, কোকো, কফি, লেমনেড দিতেও সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। চেয়ার-টেবিলের কাপড় সেই 'পুরাতন বিদেশী ছিটের। আমার গায়েও খদ্দর নেই। গা হাত পা চুলকোয় ব'লে খদ্দর পরা হ'ল না। তাঁরাই কৃপা ক'রে আমার লজ্জা দূর করলেন চা চেয়ে। খানিক পরে চা এল, সঙ্গে নিমকী ও পাঁপরভাজা। ষ্টোভ ও নুন বিলিতী সে কথা বলিনি। বললে তাঁরা নিশ্চয় খেতেন না—তখন আবার তাঁকে কাঠকয়লার উনুন ধরাতে হ'ত! তবুও অনেকের মন ওঠে না!

চা পানের পরও কথা জম্‌ছিল না। অতিথিদের সঙ্গে কিছু জেলখানার কথা কওয়া যায় না। তাঁরা অনেকেই জেলখানার ফেরৎ, এবং জেলখানায় গিয়ে তাঁরা আমাদের ওপর টেক্কা মেরেছেন বলে তাঁদের বিশ্বাস। কি জানি কেন, আমার মনটাও যেন কেমন খচ্‌ খচ্‌ করে, দেশের জন্য কিছুই করিনি ভেবে। হাতে মাছের কাঁটা ফুটলে মন যেমন সেখানেই পড়ে থাকে, আমাদের মনও তেমনি জেলখানায় পড়ে রয়েছে। অথচ জেলখানায় কষ্ট পাওয়ার বিপক্ষে আন্দোলন কিংবা ঘোঁট করাও নিতান্ত ছেলেমানুষী আবদার মনে হয়। কেননা, অত্যাচার আমরা স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছি। দেশের এই দুর্দ্দিনে সঙ্গীতালোচনা কিংবা সাহিত্যচর্চ্চা করতেও মন চায়না। উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলের নেত্রীদের মতে যখন স্কুলকলেজে পড়াশুনা করেও দেশের মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়, তখন খোসগল্প করলে আত্মা আমার জাহান্নামে যাবে। চিরকালটা মহাপাপই ক'রে এসেছি। আত্মার সদ্‌গতি করতে বাসনা হয়েছে। আবার সংস্কার বলে একটা জিনিষ আছে। হঠাৎ সাধু হই কি ক'রে? মহাত্মাজীর স্মরণাপন্ন হলাম।

আমি—অবতারবাদে বিশ্বাস হচ্ছে।

তাঁহারা—ভারতবর্ষে জন্মেছেন, তাও আবার ব্রাহ্মণকুলে, সেই ঘুরে আস্‌তেই হবে!

আমি—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলছিনা। ধর্ম্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে রক্ত ঠাণ্ডা হ'লে অবতার মানতে হয়। আমি সমাজধর্ম্মের, রাজনীতির কথা বলছি। আমি মাহাত্মাজীকে যুগাবতার মনে করি, কারণ আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটছে। আগে তাঁকে শুধু একজন নেতাই ভাবতাম। আমার রক্ত বলক্‌ তোলে দেরীতে।

তাঁহারা—সভ্যতার, শিক্ষার শিখরে আছেন কিনা তাই!

আমি—ঠাট্টা করবেন না। যদি বা গম্ভীর হলাম...

তাঁহারা—দেশের সৌভাগ্য! একটু গম্ভীর হ'লেই দেখবেন যে, রক্ত ঠাণ্ডা রাখা কত শক্ত! আজ যদি মহাত্মাজী না থাকতেন তা হ'লে দেশের নদী সব লাল হ'ত! তিনিই ঐরাবতের মতন এই রক্তগঙ্গার স্রোত রুদ্ধ কোরেছেন।

আমি—তুলনাটি ঠিক হ'ল না। যে কাজ ঐরাবত পারেনি মহাত্মাজী তাই পেরেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি একাধারে সাফল্য-মণ্ডিত ঐরাবত, এবং ভগীরথ।

তাঁহারা—আপনার কথায় সর্ব্বদাই একটু শ্লেষ থাকে। আজ ধরে নিলাম যে আপনি সোজা কথা বলছেন। আপনি

যাই বলুন না কেন, তাঁর নেতৃত্ব বাদ দিয়ে গতদশ বৎসরের ভারতের ইতিহাস আমরা কল্পনাই করতে পারি না।

আমি—ও মন্তব্যে আমার আপত্তি আছে। তাঁকে বাদ দিয়ে আপনারা যেমন গত কয়েক বৎসরের ইতিহাস কল্পনা করতে পারেন না, তেমনি আমিও গত চল্লিশ বৎসরের ভারতের ইতিহাস, ইংরাজী-শিক্ষার ইতিহাস, আমাদের দারিদ্র্যের ইতিহাস, এমন কি ইংরাজ সাম্রাজ্যের ইতিহাস প্রভৃতি বাদ দিয়ে তাঁকেও বুঝতে পারি না। এ জগতে সবেরই প্রয়োজন আছে। আমরা মানুষ ব'লে মানবত্বের মূল্য বেশী দিয়ে থাকি। কিন্তু তার মানে কি এই যে, ব্যক্তিই ইতিহাসের একমাত্র শক্তি? বড়লোকে অন্যান্য শক্তিকে ব্যবহার করেন, এবং সেই ব্যবহারের ফলে নতুন শক্তির সৃষ্টি হয়। এই নতুন শক্তি না মানুষের, না ঘটনার। তবে এ কথা ঠিক যে, এই দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের জন্য তাঁর অবতারত্বে সাধারণের বিশ্বাস অনেকটা দায়ী। তাঁর প্রতি বিশ্বাসের জন্য সরকারের প্রতি অবিশ্বাস জন্মেছে। আগে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি আমাদের দেশের লোকের কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল মনে আছে? আজ নানা কারণে রাজভক্তি কমেছে, কিন্তু ভক্তির বহর কমেনি। তাই লোকে impersonal rule ছেড়ে personal rule-এর প্রতি ভক্তিমান হয়েছে। আমিও তাই অবতারবাদে বিশ্বাস করছি। এ যেন বেদান্ত ছেড়ে বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠ! মধ্যাহ্নসূর্য্যের তীক্ষ্ণ আলো সহ্য না কোরতে পারলে গোধূলির ধূলামিশ্রিত আভাকেই ভালবাসতে হয়। কেষ্ট-বিষ্টুকে না মানলে প্রাণটা খাঁ খাঁ করে যে!

তাঁহারা—আপনি মশাই কোন দলের?

আমি—নিজের দলের। আমি আমার, আপনারা যদি

আমার দলের হন, আমি তখন হয়ত খানিকটা আপনাদের দলের হ'তে পারি। আমার মতামত ছেড়ে দিন। তার মূল্য আমারি কাছে, আপনাদের কাছে হয়ত কিছুই নেই, আর কিছু হওয়াও উচিত নয়। আমার মতামতের পিছনে যে fact-টি আছে, সেটিকেই নিন। কেননা তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দু'মত নেই। দু'মত না থাকলেই যে কোন ভাব কি আদর্শ fact হ'য়ে যায় তা বলছিনা। Fact-টি হচ্ছে—দেশব্যাপী চাঞ্চল্য।

তাঁহারা—দেশের আন্দোলনকে চাঞ্চল্য ব'লে দেশের পিঠ ঠুক্‌বেন না, কিম্বা দেশের গালে থাপ্পড় মারবেন না মশাই। এ শুধু চাঞ্চল্য নয়, এ জাগরণ। চাঞ্চল্য একটা স্নায়বিক ব্যাপার, জাগরণ মনের। চাঞ্চল্য ক্ষণস্থায়ী, জাগরণ চিরদিনের। চাঞ্চল্য আসে উত্তেজনায়, জাগরণ সম্ভব হয় —প্রেরণায়।

আমি— দেশের সুদিন এসেছে। আপনারা শুধু দেশভক্ত নন, আপনারা খাঁটি সাহিত্যিক। দোষ নেবেন না। প্রেমের কবিতা না পড়লে প্রেম যেমন শুধু অধিকারতত্ত্বই থেকে যায়, তেমনি সাহিত্য হিসাবে না ধ'রলে আন্দোলন শুধু দোলনই থেকে যায়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে যে গান, কবিতা, প্রবন্ধ, নভেল, নাটক, আজ পর্য্যন্ত লেখা হয়েছে তার একমাত্র সম্পদ হচ্চে—ভাবালুতা, ভাবের মত্ততা, অর্থাৎ ছন্দের-দোলা। সেই সব গান, কবিতা ও প্রবন্ধ আজ পর্য্যন্ত শুধু উত্তেজনারই সৃষ্টি করেছে, ভাবালুতারই প্রশ্রয় দিয়েছে। আজ যদি এই ১৯৩০ সালে, ঐ রকম চমৎকার ভাষার সাহায্যে, আপনারা চাঞ্চল্যকে জাগরণ, এবং উত্তেজনাকে প্রেরণায় পরিণত করতে

পারেন, তা হ'লে দেশের উন্নতিকামী হিসাবে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞই থাকব। একটু আলোচনা করলে আশা করি স্বাধীনতা পাবার তারিখটা পিছিয়ে যাবেনা। কত বোটানিষ্টও ত' রয়েছেন, ফুলও যথাকালে ফুটছে।

তাঁহারা—আলোচনা করুন না, কিন্তু লোকের কাছে যেন...

আমি—নিশ্চিন্ত থাকুন সে বিষয়ে—আমি কাউকে বোলবনা। আজই ত' জেলে যাচ্ছেন না! আমি মানছি যে এটা তর্কের সময় না, কেবলই কাজের সময়। সভ্যতার প্রথম যুগে হ'ত কাজ, মাঝে এল তর্ক, শেষে এল আবার সেই কাজ। চক্রবৎ সবই ঘুরে আসবে। গত কাল ছিলেন জেলে, আসছে কাল যাবেন জেলে। সভ্যতার নিয়মানুসারে আজ সন্ধ্যায় একটু কথাই ক'য়ে যান। তাতে যখন আপত্তি রয়েছে, তখন কথাই শুনে যান—মনের কাছে নিষ্পাপ থাকুন। আমাকে ধন্যবাদ দিন, পাপের গুরুভার লঘু করছি ব'লে।

তাঁহারা—বাজে কথা ছাড়ুন।

আমি—ছাড়লাম। আমি স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাপারের মধ্যে কোন বৈরীভাব দেখিনা। মনের পিছনে ও মধ্যে স্নায়ুর কায চলছে, মনের প্রকাশও হচ্ছে স্নায়ু দিয়ে।

তাঁহারা—সাধে কি আপনাদের মতামতকে জড়বাদ ব'লে লোকে ঘৃণা করে?

আমি—একটু ভুল করেছেন। মন=স্নায়ু যদি বোলতাম তা হ'লেই জড়বাদ হ'ত। দেহকে স্বীকার করলেই জড়বাদী হয়না। দেখুন, আমি খাঁটি জড়বাদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। খাঁটি জড়বাদের মধ্যে বুদ্ধির এমন একটি সততা আছে, যেটি

অন্য কোন বাদে লক্ষ্য করিনি। এর মধ্যে বুদ্ধির কোন জড়ত্ব নেই, বুদ্ধি এখানে উজ্জ্বল, শ্বেতশুভ্র, নিজের সীমা সম্বন্ধে সজ্ঞান, অথচ সীমার মধ্যে কঠিন, দুর্নিবার। কিন্তু জড়বাদের বিপক্ষে আমার আপত্তি এই যে, তার সাহায্যে আমি যেভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে চাই, সেভাবে করতে পারছি না।

তাঁহারা—আপনি যে জড়বাদকে শ্রদ্ধা করেন সেটি বৈজ্ঞানিক জড়বাদ।

আমি—ঠিক ধরেছেন। স্নায়ুর সাহায্যে মনের কাজ বোঝা, কাজ ছাড়া মনের অন্য কোন একান্ত বিশিষ্ট অস্তিত্ব ও প্রকৃতি না মানা মনোবিজ্ঞানেরই কথা। এ ছাড়া অবশ্য অন্য ধরণের জড়বাদ আছে। যাদের বুদ্ধি জড়ের সামিল, যেমন আদিম অসভ্য জাতির, তারা ভূত প্রেত প্রভৃতি অশরীরি শক্তির দ্বারা সবই নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে বিশ্বাস ক'রলেও তাদেরকে জড়বাদী বলতে পারেন। তাদের ভিন্ন রকমের মানসিক ক্রিয়া-কলাপ, রীতি, ন্যায় আছে ব'লে অনেকেই স্বীকার করেন। সে ক্রিয়া-কলাপ যে আমাদের ক্রিয়া-কলাপেরই হাওড়া ষ্টেশন বলা যায় না। বর্ত্তমান জগতে, অর্থাৎ সভ্যযুগে কিন্তু অন্য এক শ্রেণীর জড়বাদী আছেন। তাঁদেরকে চেনা যায়না বোলে তাঁদের ক্ষতি করবার ক্ষমতা বেশী।

তাঁহারা—কারা এই শত্রু ?

আমি—যাঁরা মেঘের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করেন। ভাবপ্রবণ ও কর্ম্মীর দলই ইন্দ্রজিতের বংশধর। সভ্যযুগে ভাবপ্রবণতা ও কর্ম্মপ্রাণতাই বুদ্ধির জড়কে উজাড় কোরতে পারে। ও দুটো জিনিষ বস্তুত একেরই এ-পিঠ ও-পিঠ। কর্ম্মবাদীরা স্বীকার করুন আর না করুন, যুদ্ধের পূর্ব্বে লেখা

মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কেতাবে দেখবেন যে, কর্ম্মের পিছনে রয়েছে শুধু emotion, ভাবের আবেগ। Syndicalist-রা Direct Actionএ বিশ্বাসী, তাদের দর্শন বার্গসনের কাছ থেকে ধার নেওয়া—আর বার্গসন বুদ্ধিকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছেন শুনেছেন ত ? ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে যাঁরা সমাজের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে বড় বড় কেতাব লিখেছেন তাঁরাও সামাজিক ব্যবহারের পিছনে ভাবশক্তিরই কায চলছে দেখিয়েছেন। অবশ্য আজকালকার অনেক বড় কর্ম্মবাদী-দার্শনিক বিপরীত কথা কইছেন, কিন্তু তাঁদের গুরু জেমস্ ও লাঞ্জ মনে রাখবেন। দেশের অনেক অতিসভ্য ব্যক্তি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতন বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্কুল-পাঠশালায় বৈশ্য-বৃত্তি শেখাবার পক্ষপাতী হয়েছেন। আপনারাও ঐ দলের। নচেৎ চরকা ঘুরিয়ে, টাক্‌লী চালিয়ে, কি তালগাছ কেটে দেশ স্বাধীন হবে বিশ্বাস করেন ? ভাবপ্রবণতা ও কর্ম্মপ্রাণতাই সভ্য মানুষকে নির্ব্বোধ করতে পারে। আমরা বাঙ্গালী, আমরা ভাবপ্রবণ জাতি, এই কথাই শুনে এসেছি, বিশেষ ক'রে গান্ধীযুগের পর থেকে আমরা আবার কর্ম্মগত প্রাণ হয়েছি। সোনায় সোহাগা হয়েছে! ফলে, আমরা না হ'তে পারছি আদিম অসভ্য জাতির মতন, না হ'তে পারছি য়ুরোপীয়ানদের মতন। আমাদের জড়বাদ না অসভ্য, না বৈজ্ঞানিক। এ শুধু ধোঁয়া, ভাবের ও দুরাশার। এ শুধু কুয়াশা, দুর্ভেদ্য কুয়াশা। নভেম্বর মাসে লণ্ডনে যে কয়লার কুয়াশা নামে, তার ভিতরে মানুষ, গাড়ী, ঘোড়া, মুটে-মজুর যেমন Dantesque hell-এর অভিশপ্ত জীবের মতন কিলবিল করে, এ যেন তাই। এ অবস্থা অতি ভীষণ, এ অবস্থা কল্পনা

করতে পারতেন এক ব্লেক, নয় ডোর। আমি পারি না। শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার, সব কৃমির মতন আমরা নড়ছি!

তাঁহারা—আপনি নিতান্তই morbid!

আমি—Morbid আমি, না আপনারা? ঐ রকম অন্ধকার ছেড়ে পালিয়ে আসতে না চাওয়া কি সুস্থ মনের লক্ষণ? আপনাদের মস্তিষ্কের স্নায়ু সব অসুস্থ, নচেৎ সেখানে স্নায়ু আছে স্বীকার কোরতে ভয় পান!

তাঁহারা—বেশ, না হয় স্বীকার কোরলাম। তার পর?

আমি—তার পর নয়, তা হ'লে, এই আন্দোলনটাকে স্নায়বিক চাঞ্চল্য বোল্লে কোন দোষ হয় না। চঞ্চলতা একটা পাপ নয়, ওটা বুদ্ধির গোড়ার কথা। চঞ্চলতা ক্ষণস্থায়ী বোলেই তাকে অশ্রদ্ধা করা যায় না, যেমন অচঞ্চলকে সনাতন ও চিরস্থায়ী বোলেই তাকে কিছু শ্রদ্ধা করা যায় না।

তাঁহারা—যেটা চলে আসছে তার এতদিন ধরে চলে আসবার শক্তিই কি তার সত্যের একটা অঙ্গ নয়?

আমি—আপনাদের আন্দোলন কি চিরকালই চলছে? তা হ'লে এতদিনে খুব কাজ ক'রেছেন ত'! আমাদের তর্কটা ঘরোয়া নয়, তাই একটি নতুন প্রশ্ন করছি। চলবার শক্তি বোলতে কি বোঝেন? এক চলবার পিছনে এই শক্তি থাকতে পারে, আর এক চলতে চলতে এই শক্তি তৈরী হচ্ছে হ'তে পারে। এ দুটি ব্যাখ্যা ছাড়া আর এক ব্যাখ্যা এই হয় যে, দূরদেশী বাইরের এক শক্তি-কেন্দ্র চলার সমগ্র ব্যবহারকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। তৃতীয় ব্যাখ্যাটী মোটেই অসঙ্গত নয়, তবে কি জানেন, explanation of a thing always lies outside the thing মানতে হ'লে ন্যায়ের ধারাবাহিকতা

ভেঙ্গে যায়। সাহিত্যে আজকাল discontinuity-র ছড়াছড়ি, পদার্থবিজ্ঞানেও তাই বোলছে শুনছি, সমাজ ও রাজ্য আজকাল ছোট ছোট গণ্ডীতে ভেঙ্গে যাচ্ছে, কিন্তু ন্যায়ের লাইন এখনও ভাঙ্গেনি—তার পারম্পর্য্য এখনও নিরবচ্ছিন্ন রয়েছে। সাধারণত তাই থাকতে বাধ্য—যতদিন বাক্য সাধারণের জন্য স্থূল অর্থ বহন কোরতে থাকবে। Symbolist কবিতায় বাক্য অন্য একটি স্বরগত অর্থের ইঙ্গিত করে বটে, কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে symbolism অর্থাৎ musical value-র দাম কম। Symbolic logic আমার মাথায় প্রবেশ করে না—সাধারণের মাথাতেও যে প্রবেশ করে বোলতে পারি না। যদিও ধরা যায় যে explanation is outside the thing, তা হ'লেও বোলতে পারি যে, ভিতরের ও বাহিরের কারণের মধ্যে তফাৎ রয়েছে আমাদেরই অজ্ঞানতার জন্য। তু'দিন পরে হয়ত link-টি আর missing থাকবে না। বাইরের কারণ হয়ত জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের কারণ কিংবা কার্য্য বোলেই গণ্য হবে; যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমান থাকলে আজকার acquired trait তু'লাখ বৎসর পরে hereditary trait-এর সামিল ব'লে গণ্য হ'তে পারে। অতএব চলবার শক্তি বাইরের কি ভবিষ্যতের আকর্ষণ নয় বোলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, চলতে চলতেই চলার শক্তি অর্জ্জিত হয়। ভেবে দেখলে বুঝবেন যে এটি শুধু বাক্য মাত্র। 'এ জগতে সবই চলছে'—এটি একটি statement, তার ব্যাখ্যা, অর্থাৎ বিশ্লেষণ ক'রে কারণ বা'র করতে গিয়ে শুধু যদি আর একটি statement করি, তা হ'লে কোন লাভ হ'ল না। হ'ল

পুনরুক্তি মাত্র। একটি বাক্যনিহিত সম্বন্ধ আর তার ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্কটা কী ধরণের? ব্যাখ্যা হবে সম্বন্ধটির পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয় বা পদের প্রকৃত বিবরণ নিয়ে, (including conditioning relations) যার জন্য সম্বন্ধটি ঘটছে। শুধু তাই নয়, ব্যাখ্যার মধ্যে যে subject ও predicate থাকবে তারা প্রত্যেকটি স্বাধীন, একটি অন্যটার ওপর নির্ভর কোরবে না, কিংবা অন্যের দ্বারা সূচিত হবে না। ব্যাখ্যাটি নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হওয়া চাই। এই ব্যাখ্যার সাহায্যে আবার নতুন তথ্য, নতুন অর্থ পাওয়া চাই। প্রকৃত ব্যাখ্যার এই কয়টি চিহ্ন। আপনার 'চলবার পথেই চলার শক্তি অর্জ্জিত হয়' ব্যাখ্যার মধ্যে এই কয়টি লক্ষণ পেয়েছেন? আমি পাইনি। সেইজন্য একে ব্যাখ্যাই বলি না। এটি বলবার চমৎকার ভঙ্গী—বার্গসনের ভাষায় ও কবিতায় শোভা পায়। কিন্তু তর্কবুদ্ধিতে এ ব্যাখ্যা টেঁকে না। বার্গসন যত বড় লেখক তত বড় দার্শনিক নন্। বার্গসনের উত্তর বহুপূর্ব্বেই ম'লেয়ার দিয়েছেন—'আফিমে ঘুম আসে কেন? আফিমের মধ্যেই ঘুম আনবার শক্তি রয়েছে ব'লে।' সে যাক, তৃতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে—চলবার পিছনে এই শক্তি থাকতে পারে। Elan vital-এর কথা ছেড়ে দিচ্ছি। এই তৃতীয় ব্যাখ্যার পিছনে কি presupposition রয়েছে বুঝেছেন? একটা জার্ম্মাণ ভূত, a Frankenstein monster of Time-God। এই ভূত মহাকালের অনুচর নয়, স্বয়ং মহাকাল, নিজে। জনকয়েক জার্ম্মাণ দার্শনিকদের মতে 'কাল' একটি অখণ্ড, স্বাধীন দিব্যবস্তু কিংবা শক্তি, যার তাড়নায় আমরা সবাই এক কদমে চলেছি। কালের বিশ্লেষণে কিন্তু বার্গসন খুব বাহাদুরী দেখিয়েছেন। আজকাল সময় নিয়ে অনেক

পরীক্ষা চলছে। সে পরীক্ষার ফল গ্রহণ ক'রলে কাল ব'লে স্বতন্ত্র একটা কিছুর ওপর বিশ্বাস রাখা যায় না। মনের দিক থেকে সময়বোধ নিতান্ত আপনার, আমার। আমাদের সমবেত চেষ্টায় সমাজ গড়ে উঠেছে, আমরা সেই সমাজের মধ্যে বাস করি, অতএব সামাজিক সুবিধার জন্য, আমরা নিজেদের স্বার্থের দ্বারা গঠিত সময়কে স্থগিত রেখে একটা গড়পড়তা সাধারণ সময় ঠিক কোরে নিয়েছি। এ যেন শ্রুতি-scale-এর বদলে হারমনিয়মের tempered scale-এ গলা সাধার মতন। যখন নেহাৎ নিজের স্বার্থ জোর দেয়, তখন অবশ্য সামাজিক গড়পড়তা সময়কে বর্জ্জন করি। এই দেখুন, আমার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে আপনারা ব্যস্ত হয়েছেন—আমার কিন্তু নিজের কথা নিজের শুনতে ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে এইমাত্র আরম্ভ করেছি। আপনাদের গৃহিণীরা বাপের বাড়ী গেলে মনে হয় যেন যুগ-যুগান্তর অতীত হ'য়েছে, তাঁদেরকে চ'লে আসবার জন্য চিঠি দিলে তাঁরা লেখেন—'এই ত মোটে একমাস মা-বাপের কাছে আছি, আসছে মাস পড়লেই যাবো, লক্ষ্মীটি রাগ কোরোনা।' আবার ভিন্ন সমাজে স্বার্থের জন্য সময় সম্বন্ধে ভিন্ন রকমের ধারণা। ইংরেজরা বোলছেন, 'হে ভারতবাসী, তোমরা বড় তাড়াতাড়ি Dominion-Status চাইছ, সব জিনিষেরই অভিব্যক্তি আছে, এবং অভিব্যক্তি চলে কচ্ছপের চালে।' আমরা উত্তর দিচ্ছি, 'কিছুই তাড়াতাড়ি নয়, সময় এসেছে—সময় এসেছে কেন, সময় গিয়েছে, আর এ অবস্থা সহ্য কর্ত্তে পারছি না। বার্কের সেই broad slow march from precedent to precedent আজকাল খাটে না। জীববিজ্ঞানেও বলছে যে mutation হয়, ব্যাঙের মতন অনেক সময়

জীব লাফিয়ে চলে'। জুলাই সংখ্যার মডার্ণ রিভিউতে রামানন্দবাবু এই কথা অতি সুস্পষ্ট ও তীব্রভাবেই লিখেছেন। অতএব দেখছেন যে একই বিষয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মত ভিন্ন। সাইমন সাহেবের এক ঘড়ি, আমাদের ঘড়ি অন্য। তার ওপর Greenwich time রয়েছে, তারও বাইরে রয়েছে Geological time। আরও বাইরে যেতে চান ত' ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত রয়েছে, মহাদেবের 'তপোভঙ্গ' রয়েছে। আমি চাইনা অতদূর যেতে—আপনারা যেতে চান নাকি? আপনার আমার ঘড়িই বলুন, স্বদেশী বিদেশী ঘড়িই বলুন, আর বিশ্ব-ঘড়িই কল্পনা করুন, দরকারের সময় কি সঙ্কট-কালে কোন ঘড়িই অন্যের ঘড়ির সঙ্গে এক লয়ে চলে না—সব চাল বিগড়ে যায়। League of Nations-কে কেউ মনে করেন fact achieved, কেউ মনে করেন idea yet to be realised—তফাৎ কোথায়? তফাৎ এই কাল সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে, কালের গতির হার নিয়ে, উদ্দেশ্য নিয়ে, যে ধারণা, যে হার, যে উদ্দেশ্য মূলত নির্ভর কোরছে আপনাদের, আমাদের স্বার্থের দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ সমাজের ভয়, ভাবনা, রুচি শিক্ষা, দীক্ষা, সুবিধার ওপর। আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা যখন বলেন, 'যেটা এতদিন ধ'রে চলে আসছে, তার এতদিন ধ'রে চলে আসবার শক্তিই তার সত্যের একটি অঙ্গ', তখন আপনারা কাল-বস্তুকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বনিয়ন্ত্রিত শক্তি ভাবছেন, জার্ম্মাণ পণ্ডিতদেরই মতন। তাই যদি হয়, তা হ'লে দেশ আজ স্বাধীন হ'লেও যা, না হ'লেও তা, আবার দশ লাখ বছর পরে স্বাধীন হ'লেও তাই—কেন না ব্রহ্মা কিংবা মহা-কালের কাছে দু' দশ লাখ বছর সার্থকতাশূন্য একটি নিমেষ

মাত্র। এই দেখুন না, বড় বড় জাঁদরেল সভ্যতা লোপ পেয়েছে ; তার ফলে মহাকালের মুখে স্মিতহাস্যই ফুটে উঠেছে। কালকে যদি চক্রও ভাবেন, তা হ'লেও অধীর হ'লে চলবে না—শুধু ধীর হ'য়ে Spengler, Petrie ও পুরাণ পড়লেই চল্‌বে। 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে' মন্ত্রজপ কোরলেই ব্যস, সব হ'য়ে গেল—!

তাঁহারা—দাঁড়ান মশাই, একটু থিতিয়ে নিই। স্নায়বিক চাঞ্চল্য দোষের নয়, এবং ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্যও পাপ নয়, বুঝলাম। অর্থাৎ···

আমি—অর্থাৎ যে কায দেশে হচ্ছে তা নিয়ে খুসী, কিংবা তার সম্বন্ধে অত কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন নেই। আপনাদের এই সলজ্জভাব কেন জানেন ? একটা মাত্র কারণ বলি, বিচার-বুদ্ধির ওপর, বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির ওপর স্থির বিশ্বাসের অভাব। আপনাদের মনে গোটা কয়েক ধর্ম্মের গাঁট আছে, সেগুলি ছাড়াতে পারছেন না, সেই জন্য। আপনারা নিতান্তই ধর্ম্মপ্রাণ !

তাঁহারা—ঠিক জানি না মশাই। আচ্ছা নয় তাই হ'ল। এখন দেশ স্বাধীন হয় কি ক'রে ?

আমি—সে আমি কি জানি ? আমি ও-সব নিয়ে গা ও মাথা ঘামাই না।

তাঁহারা—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে যখন চাঞ্চল্য ও ক্ষণস্থায়িত্বকে দোষের কিছু নয় প্রমাণ কোরলেন, তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে, আপনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে চিন্তা করার একান্ত পক্ষপাতী।

আমি—আমি যখন চিন্তাশীলতারই পক্ষপাতী, তখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পদ্ধতিতে আস্থাবান হতেই পারি না। দেশের স্বাধীনতা ব'লতে মনের স্বাধীনতা বোঝাই

আমাদের মত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে স্বাভাবিক। আর যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্য যে কোন পদ্ধতি অপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত, তখন দেশ স্বাধীন হবার জন্য, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে বিচার-বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করা, এই একমাত্র দাওয়াই বাৎলাতে পারি—যদি অবশ্য শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই আন্দোলন থেকে বহিষ্কৃত না করেন।

তাঁহারা—আমরা আপনাদের চাই, মানুষ হিসাবে, শিক্ষিত ব্যক্তি কিংবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী জীব হিসাবে নয়। আপনাদের শিক্ষা, বিশ্বাস ও বিচার-পদ্ধতি আমাদের ভাল লাগে না। খোসামোদ করছি না—আপনাদের মধ্যে অনেকেই অ-শিক্ষিত, কু-শিক্ষিত, আত্মাভিমানী; আপনাদের বিশ্বাস, intellectual coviction-গুলি স্বার্থেরই ভিন্নরূপ, আপনাদের পদ্ধতি নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক, অতএব নিষ্ঠুর। হবে না কেন? আপনাদের একটা Trade Union আছে, সেই দলকে ত' বাঁচিয়ে রাখতে হবে! আপনারা নিজেরাই ত' আন্দোলনের বাইরে থাকতে চান! আপনাদের দোষেই ত সব আন্দোলন anti-intellectual হ'তে বাধ্য! আপনাদের জন্যই ত প্রেরণার উৎস শুকিয়ে যায়! বুদ্ধির তাপে হৃদয় আপনাদের মরুভূমি হয়েছে, আর তারই শাপে আপনারা আমাদের সব প্রেরণাকে, সব হৃদয়াবেগকে শুকিয়ে দেন, কিংবা সেগুলি শুকিয়ে যাক বাঞ্ছা করেন। নিজেদের সম্পত্তি নেই ব'লে আর কারুর সম্পত্তি পর্য্যন্ত থাকবে না! আপনারা কী ভীষণ হিংসুক!

আমি—আপনাদের মধ্যে যাঁরা সোশিয়ালিষ্ট তাঁদের মনোভাব খানিকটা আমাদের মতন নয় কি? সে কথা

যাক্—থান ইঁট ছুঁড়ে মারতে একটু মায়া হয় না আপনাদের? তবুও আপনারা জেলে গিয়েছেন, আমি যখন যাই নি, তখন আপনাদের ওপর অভিমান পর্য্যন্ত কোরব না। আমি আপনাদের চেয়ে আরো বেশীদূর পর্য্যন্ত যেতে চাই। আপনাদের সব কথাই মানি। কী জানেন, আমরা ভারী সাবধানী লোক, আমরা স্থিতির পক্ষপাতী, আমরা রক্ষণশীল, সেই জন্যই ত' প্রেরণা, হৃদয়াবেগকে অত সন্দেহের চক্ষে দেখি। বন্যার মতন কোন প্রেরণা এসে আমাদেরকে কখনও স্থানচ্যুত করতে পারেনা। আমরা প্রেমে পর্য্যন্ত কখনও পড়িনা। কোন বুদ্ধিমান, থুড়ী, বুদ্ধিজীবীকে প্রেমে পড়তে দেখিনি। হয়ত ভুল বলছি। বুদ্ধিজীবীরা যে ধরণের প্রেমে পড়েন, তাকে আপনারা প্রেমই বলবেন না। আমরা কেতাব লিখি—সব 'স্কলার' হবার জন্য। তাও বোধ হয় নয়—নিজেদের চাকরী বজায় রাখা, না হয় পদোন্নতির জন্য, এই হ'ল সত্য কথা। এই ত' হাজার হাজার পণ্ডিত রয়েছেন, হাজার হাজার কেতাবও তাঁরা লিখছেন, অনেক কেতাবও পড়তে বাধ্য হয়েছি—আপনারা যাকে প্রেরণা বলেন, সে প্রেরণা কোন কেতাবে আছে লক্ষ্য করিনি। বিদেশী বুলির সংক্ষিপ্তসারের মধ্যে, পাদটীকার মধ্যে যে সত্যকারের প্রেরণা আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারে বিশ্বাস করিনা। প্রেরণা কি আবেগ আমাদের ধাতে নেই। অবশ্য না থাকলেই আমরা যে অপদার্থ তাও মনে কোরতে পারিনা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে···

তাঁহারা—ঐ দেখলেন ত! নিজেদের দোষকে গুণে পরিণত করবার ক্ষমতা আপনাদের আছে—আপনিই ত' এই অভ্যাসকে rationalise করা বলেন! আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা

তুলবেন না। আপনাকে কতবার বোলেছি যে ও পদ্ধতি আমাদের ভাল লাগে না।

আমি—কারণ কি?

তাঁহারা—কারণ এই, পদ্ধতি ও একটি মানুষের, বৈজ্ঞানি-কের। এইটাই বড় কথা। আর আপনারা সেই মানুষকে বাদ দিয়ে তারই অবলম্বিত পদ্ধতিকে বড় ক'রে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, সেই method-কেই আবার মানুষেরই বেলা খাটাচ্ছেন। দেশ স্বাধীন হবার জন্য লোকের মস্তিষ্ক পরিষ্কৃত হোক, বুদ্ধি খাটিয়ে সকলে কায করুক, হাজার বার এ কামনা করি। কিন্তু মাথাটি যখন মানুষের, তখন সেই গোটা বুদ্ধিমান মানুষই, সেই গোটা বৈজ্ঞানিকই আমাদের দেশের লোকের আদর্শ হোক না কেন? আমাদের মনে হয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বদলে বৈজ্ঞানি-কের সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহায়ক হবে। তার আদর্শবাদ, তার ত্যাগ, তার শ্রমশীলতা, তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, তার প্রেরণা আমাদের দেশের লোকের ওপর ভর করুক! এমন কি তার দোষ পর্য্যন্ত এলেও ক্ষতি নেই—কেননা আমাদের জাতিগত অন্যান্য বিপরীত গুণ সে ক্ষতির পূরণ করবে শপথ ক'রে বোলতে পারি। পদ্ধতির বদলে মনুষ্যত্বকে গ্রহণ ক'রলে জাতীয়তার পক্ষেও সুবিধা, কেননা পদ্ধতি হচ্ছে বিশ্বজনীন। জার্ম্মাণ বিজ্ঞান কি ফরাসী বিজ্ঞান ব'লে দুটো আলাদা বিজ্ঞান নেই। ব্যবসা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার-বার্ত্তা প্রভৃতির মতনই বিজ্ঞান একটি বিশ্বের বন্ধন, এই শুনেছি।

আমি—রবিবাবুর ওপর আপনাদের অত কৃপা দেখে আমি মুহ্যমান হয়েছি—তাঁকে আজই তার ক'রে রাশিয়া থেকে ডেকে পাঠাচ্ছি। গম্ভীর হচ্ছি, আপনারা দেখি বিশ্বজনীনতাকে দেশাত্ম-

বোধের অন্তরায় ভাবেন। আমার কিন্তু অন্য মত। প্রকৃত দেশাত্মবোধ কখনও বিশ্বজনীনতার বিরোধী হ'তে পারে না। আজ এ আলোচনা থাক। আপনারা অনেক দামী কথা বলেছেন—তার একটা নিয়ে আলোচনা করলেই রাত কাটান যায়। আপনারা গোটা মানুষকে গ্রহণ করতে উপদেশ দিচ্ছেন। ভাল কথা, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পূর্ণতা তার পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে সম্ভব হয় কি ? এখানে আমার একটু সন্দেহ উঠেছে। আগে ভাবতাম যে ব্যক্তিত্ব একটা সত্ত্বা, এখন ভাবছি রূপ ভিন্ন সত্ত্বার কোন অস্তিত্ব নেই। সত্ত্বা বোলতে তার বিকাশ ছাড়া অন্য কিছু আমরা—অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা—ভাবতেই পারি না। বেদান্তের নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মবস্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারিনা—এই হ'ল মোদ্দা কথা। হয়ত এই অনুপলব্ধি বিদেশী শিক্ষার দ্বারা দুষ্ট বুদ্ধির অক্ষমতা মাত্র। কারণ যাই হোক না কেন, ব্যক্তিত্ব যখন একটা concrete বস্তু, তখন তার রূপ ও গঠন থাকতে বাধ্য। যখন রূপ ও গঠন থাকবে, তখন তার গঠননীতি ও রূপধর্ম্ম থাকবেই থাকবে। নতুবা আর্টিষ্টের ব্যক্তিত্ব বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিত্ব থেকে খানিকটা পৃথক হয় কেন ? এই হিসাবেই প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের value unique, নচেৎ personality-র কোন মানে নেই।

তাঁহারা—তা হ'লেও ও পদ্ধতিকে প্রধান করতে পারছিনা। যদি একটি পদ্ধতি থাকত, তা হ'লেও না হয় পারতাম। কিন্তু আপনারই কথা অনুসারে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের পদ্ধতি unique হবে তার নিজত্বের রঙ লাগিয়ে। আমরা অতশত জানিনা, তবে মনে হয় যে persoality is not the same thing as individuality।

আমি—আপনাদের ঠিকই মনে হয়। তবে personality is based on individuality যদি মানেন তা হ'লেও যথেষ্ট হবে। কেননা, আপনাদের এই মানার ওপর আপনাদের ও আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। যদি ব্যক্তিত্বের ওপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হ'লে সেই ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনাই সমাজের একটি প্রধান কাজ হ'য়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দেশাত্মবোধ দুটিই ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনের যন্ত্র, উপায়। উপায় হিসাবেই তাদেরকে গ্রহণ করুন না!

তাঁহারা—কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ?

আমি—সেটি তাদের কায দেখেই বোঝা যাবে। আমি শুধু এইটুকু বোলতে চাই যে দুটি উপায়ের মধ্যে জন্মগত কোন ভীষণ শত্রুতা নেই। সাধারণের সুবিধা, উপকার, সাধারণত্বই দুটি উপায়েরই আদি, মধ্য ও অন্তলীলা। দুটিই আমাদের ছোট আমিকে ডুবিয়ে দিতে শেখায়। বিজ্ঞান-সাধনাতে যেমন নিজের ওপর নজর রাখতে হয়, স্বদেশ-সাধনাতেও তেমনি নিজের স্বার্থ ভুলতে হয়। সব চেয়ে বড় কথা এই যে কোনটাতেই বড় আমিকে ছাড়তে হয় না—সত্যকারের নিজত্ব-টুকু বলি দিতে হয় না। দেশের এমন দুরবস্থা যে 'ছোট আমি'কে ত্যাগ করা শক্ত হয়ে উঠেছে। আপনারা এত বড় আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন—ঝড় তুলেছেন, ঝড়ের মধ্যে শান্তিময় কেন্দ্রটিকে আলাদা না রেখে ধূলায় ঢেকে রেখেছেন কেন? সেখানে কাউকে বসতে দেননা কেন, কেউ বসতে গেলে আপত্তি করেন কেন, ধূলা ছুঁড়ে তার চোখে মারেন কেন? আজ যদি কেউ এই আন্দোলনের দোষগুণ বিচার করেন, কাল কি তাঁকে 'টোডিকা বাচ্ছা' ব'লে গাল দেবেন না?

শুধু তাই নয়, এতদিন কংগ্রেস কায করছে ত'—কই কত statistics জোগাড় হ'য়েছে, যার সাহায্যে আমরা দেশ সম্বন্ধে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে আসতে পারি? গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে আমার এই আপত্তি যে, সে কেবলই আমার ছোট আমিকে pander করছে, আমার personality-র পথে অন্তরায় হয়েছে, কিংবা বাধাসৃষ্টি করছে। সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় লোভ অর্থাৎ ভয়। সব ধারেই কেবল জুজুর ভয় দেখাচ্ছে মশাই, কেবল জুজুর ভয়! আমি অন্য সম্প্রদায়ের কথা জানিনা—তবে আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে শিক্ষিত অধ্যাপক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি মানুষ দেখিনি যিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সাহস ক'রে সত্যপথ অবলম্বন করেছেন। চাকরী ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেবার কথা বলছিনা। আমরা প্রত্যেকেই, একজনকেও বাদ দিয়ে বলছিনা, অত্যন্ত সাবধানী, ভীরু ও অপদার্থ। বই পড়ার ও লেখার মুখে আগুন! বিদ্যার দোহাই দিয়ে নিজের কাছে অনেক জুচ্চুরী করেছি আমরা। আপনারা যদি ধরতে পেরে থাকেন তবেই দেশের মঙ্গল। নচেৎ দেশ জাহান্নামে যাক্! দেশের যাঁরা ব্রাহ্মণ হবেন, তাঁরা যদি এই হন তা' হলে...

তাঁহারা—যাক্—মাথা খারাপ করবেন না, আবার ঘুম আসবে না। আজ যাই আমরা।

আমি—নিতান্তই যাবেন? আমাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে স'রে পড়বেন? আপনারাই সত্যকারের নেতা হবার যোগ্য! জেলে গিয়ে আমার আত্মার জন্য প্রার্থনা করবেন। আমার হাতে একটু সময় নেই। আপনাদের কাছে যা' শিখলাম, নোটবুকে লিখে রাখতে হবে। পরিহাস করছিনা।

তাঁহারা—আপনাকে ও আপনার গুরুকে আমরা চিনি।

আমি—যদি আমার গুরুদেবকে চিনতেন তা' হলেও কিছু কায হ'ত! আচ্ছা আজ তা' হ'লে...

তাঁহারা—যদি জেলে না যাই, তা হলে সময় পেলেই আসব।

আমি—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—

তাঁহারা—আজও রাজার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইনি। তাই বিরক্ত হ'তে এসেছি। সে দিন 'ছোট আমি'-কে তাড়াতে ব'ল্লেন, তাড়াই কি করে?

আমি—কবে আমি 'ছোট আমি'-কে দূর করতে বোল্লাম? আমি শুধু বলেছি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে চিন্তা করলে, এবং সেই চিন্তার ফলে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগ্রত হ'লে, 'ছোট আমি' অবান্তরিত হবে। পরে যেটি ফুটে উঠবে, তার রূপ অতি মনোহর, তার প্রকৃতি শান্ত, তার আলো উজ্জ্বল, স্থির,—নির্ব্বাত প্রদীপবৎ। তাতে রেড়ীর তেলের গন্ধ, কেরোসিন তেলের ধোঁয়া পর্য্যন্ত থাকে না। শ্রীঅরবিন্দের কথা স্মরণ করুন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর কবি কি লিখেছিলেন মনে আছে ত'? তাঁর 'দেশাত্মবোধ' পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে। সেই জন্যই ত' বলি, দেশের স্বাধীনতা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু হ'লেও, স্বাধীনতার প্রেরণা, প্রকাশ ও পরিণতি প্রত্যেক ব্যক্তির personality-তে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাইরের ঘটনা ও অবস্থা আমাদের মুক্তির সব উপায়কেই, পরিণতির সব পন্থাকেই বেঁধে দিয়েছে। আমার অনুরোধ, খদ্দর ছেড়ে, প্রত্যেকে নিজের উপায় সৃষ্টি করুন, নিজের রাস্তা কেটে নিন্, স্বধর্ম্ম তৈরী করুন। তবেই ছোট আমি কর্পূরের মত উবে যাবে। এই প্রত্যেকের নিজত্বের মধ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রয়েছে, এখন জমি চাষ করে আয় বাড়ান। এইখানকার তাড়নার নামই প্রেরণা, এরই তাগিদের নামই জাগরণ।

খদ্দরের দৃষ্টান্ত দিলাম বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সুপরিচিত প্রতীক হিসাবে।

তাঁহারা—আমাদের গোটাকয়েক প্রশ্ন আছে। বিদেশী রাজার বিপক্ষে আপনার আপত্তি কি? ইংরেজরাজের অধীনে ব্যক্তিত্বের কতটুকু বিকাশ সম্ভব হয়েছে বিবেচনা করেন? স্বাধীন ভারতে সে বিকাশ আরো সহজ ও সুন্দর হবে কি মনে করেন?

আমি—এ সব সাঙ্ঘাতিক প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লে সিগারেট চাই, খাচ্ছি বিড়ি। আচ্ছা, বিড়ির পাতায় ভিটামিন্ পাওয়া গেছে না কি? যদি তাই হয়, তা হ'লে বিড়ির দৌলতে হিন্দু-মুসলমানের একমাত্র সমস্যার, অর্থাৎ অন্ন-সমস্যার এবং স্বাস্থ্য-সমস্যার একত্র সমাধান হয়। দেখুন, একত্র সব সমস্যার সমাধান না হ'লে তাকে ভারতবর্ষীয় সমাধানই বলা যায় না—মানেন ত'? এই যেমন চরখা?

তাঁহারা—যথা, আপনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি! প্রশ্নের উত্তর দিন, অল্প কথায়।

আমি—আপত্তি কি, এক কথায় বলা যায় না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, খানিকটা, এবং কয়েক জনের। এটি পার্লামেণ্টারি জবাব। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর, হ'তে পারে, না হ'তে পারে, আবার 'হ'তে পারে না হ'তে পারে' তাও হ'তে পারে, তাও নাও হ'তে পারে। এটি নবদ্বীপের উত্তর। আমার ভেতর এই পূর্ব্ব-পশ্চিমের ইড়া-পিঙ্গলা বইছে।

তাঁহারা—আজ হ'ল কি আপনার?

আমি—রোজই যা হয়। আজ একটু বেশী ভয় হচ্ছে, এই মাত্র। আচ্ছা, বিদেশী কথাটির অর্থ কি? অর্থ হচ্ছে, যা স্বদেশ-জাত নয়, অর্থাৎ ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রাশিয়ান,

আমেরিকান, আফ্রিকান নয়, আবার চীনে, জাপানী, আরবী, তুর্কীও নয়। যে সমাজ বা জাতি কিছুকাল ধ'রে ভারতবর্ষে বসবাস করছেন তাঁদেরকে কী বলবেন? আমাদেরই অর্থাৎ আর্য্য জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা বাইরে থেকে এসেছিলেন, ভারতবর্ষকেই তাঁদের জন্মস্থান বলা যায় না, বৈজ্ঞানিক-হিসাবে। তারও পূর্ব্বে কোল, ভীল, ব্রাহুই জাতির আদিপুরুষ শুন্‌ছি স্বমের-আক্কাড দেশ থেকে এসেছিল। আমি আবার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণীর, কুলীন, আমরাও কনৌজ থেকে বাংলা দেশে যাই ব'লে প্রবাদ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে আর্য্যভূমি বলা হয়; নিজেকে কনৌজিয়া বলেও পরিচয় দিই না। অতএব কে কোথা থেকে আসছে, কে কোন্ জাতি তার ওপর বিদেশী কথার অর্থ নির্ভর করছে না। জাতিতত্ত্বে জাতের গোঁড়ামি আর নেই। বাংলা দেশের নিম্নশ্রেণীর জাতিরাই বাংলার খাঁটি স্বদেশী।

তাঁহারা—কে কবে এসেছে তার ওপরও নয়?

আমি—না। যদি তাই হ'ত, তা হ'লে বিহারে বাঙ্গালীর অত অপমান কেন? তা হ'লে ভারতবর্ষকে কোলভীলস্থান না বলে, হিন্দুস্থান বলা হয় কেন? আদৎ কথা এই যে, স্বাদেশিকতার অধিকার অর্জ্জন করতে হয়। যে ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে জন্মগ্রহণ করেও মনে মনে এক অতীত স্বুবর্ণযুগের কল্পবাসী, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হ'লেও আপনার আমার স্বদেশবাসী নন্। সেই জন্য যাঁরা বৈদিকযুগে প্রত্যাবর্ত্তন করতে উপদেশ দেন তাঁদেরকে আমি বিদেশী ভাবি।

তাঁহারা—এক কথায় আপনি দেশের ঋণকে মাথা পেতে নিতে রাজি—এই নয় কি?

আমি—খানিকটা, যখন সে ঋণ কোন productive purpose-এ ব্যবহৃত হচ্ছে দেখি তখনই আমি কৃতজ্ঞ। মোগল-পাঠান প্রভৃতি মুসলমান বিজেতার ঋণকে আমি বিজেতার জরিমানা হিসাবে দেখতে পারি না। সে ঋণকে আমি তাজমহল, ফতেপুর-সিক্রী, মিঞাকি মল্লারের দিক থেকেই দেখি। শুধু তাই নয়, একত্র বসবাস করার ফলে হিন্দু-মুসলমান একটি নিখিল ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। গ্রাম্য ও গোষ্ঠীজীবনের দায়িত্ব, জাতি ও শ্রেণীবিচার, বিধবা-বিবাহ বর্জ্জনের দোষগুণ, এবং অপার্থিব শক্তির প্রতি আস্থা দুটি ভিন্ন সমাজ-ধর্ম্মকে অনেকটা একত্রিত করেছে। এই ভারতবর্ষেরই জমি চাষ ক'রে, হিন্দুস্থানের ভাষাকে অদল-বদল ক'রে, পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা, রান্না-বান্না ও অন্যান্য নানারকমের মানসিক ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সংস্কারকে উল্‌টে-পাল্‌টে, অন্য সমাজের প্রপীড়িত মানুষদের বুকে টেনে নিয়ে, পাঁচ সাতশ' বছরকার পূর্ব্বের বিজেতার দল ভারতবর্ষের অন্যান্য অধিবাসীদেরই মতন ভারতবাসী বলে গণ্য হবার অধিকার অর্জ্জন করেছেন। মুসলমান রাজের সঙ্গে ইংরেজ-রাজের অনেক তফাৎ আছে। তা থাকলেও আমি ইংরাজের ঋণ নাকোচ করতে পারি না। ইতিহাস পড়ে দেখেছি যে ইংরাজের তথাকথিত দান বেশীর ভাগ সময়েই স্বার্থসিদ্ধির এক একটি মোহন রূপ। তবুও এই ইংরাজের কাছ থেকে আমরা এমন গোটাকয়েক অমূল্য বস্তু পেয়েছি যার জোরেই আমরা নবজীবন লাভ করেছি। এই কি যথেষ্ট নয়? তাঁদের ব্যারাক-স্থাপত্য, গোরার-বাত্তির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু তাঁদের সাহিত্যের, ইতিহাসের ঋণ ভুলি কি করে? যদি সে সাহিত্য, সে ইতিহাস আমাদের চিন্তাধারা

ও কার্য্যাবলীকে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত করতে পেরে থাকে, তা হ'লে আজ না হয় দু'দিন পরে সেই ইংরাজকে মনের স্বদেশ-বাসী বলে গ্রহণ করতেই হবে।

তাঁহারা—ইংলণ্ডের ইংরেজ এক চীজ্, আর এখানকার আমলাতন্ত্রের, পল্টনের, পাট-কলের সাহেব দুস্‌রা চীজ্।

আমি—কবিও তাই বলেছেন। একটু তফাৎ হবেই হবে। বিদেশের ধন লুণ্ঠন করতে হ'লে হয় কামান, না হয় ভণ্ডামির আশ্রয় নিতে হয়! কামান-বন্দুক আজকাল চলে না, তাই ইংরেজ-রাজ যেটি আমাদের চোখের সামনে ধরে থাকেন তার নাম আমাদেরকে সভ্য, ভদ্র, স্বাবলম্বী করবার প্রাণপণ প্রয়াস। অবশ্য লাঠি-চার্জ্জের কথা ভুলিনি।

তাঁহারা—দেখুন, ও রকম একটু আধটু মৃদু তাড়না মাপ করতে হবে! ছোট ছেলে ফাজিল হ'লে মাষ্টারের কাছে ধমক্ খাওয়াই উচিৎ!

আমি—অমন হৃদয়-বিদারক ঠাট্টা করলে ইংরেজরা পর্য্যন্ত লজ্জিত হবেন—আমার কথা ত' ছার!

তাঁহারা—আচ্ছা আর লজ্জা দেবো না। কি জানেন, তাঁরা যদি বলতেন যে তাঁদেরই স্বার্থের জন্য, অন্নের জন্য, তাঁরা আমাদেরকে পরাধীন রাখতে চান, তা হ'লে তাঁদের শাসন-পদ্ধতিকে বুঝতাম। কিন্তু শান্তির জন্য, সভ্যতার জন্য, আমাদের উপকারের জন্য তাঁরা আমাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিচ্ছেন না, অনেক চেষ্টা করছেন, অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, তবু পারছেন না, আমাদের দোষে, আমাদের রক্তগত, সমাজ-গত অকর্ম্মণ্যতারই দরুণ, এবং না পেরে তাঁদের বুক ফেটে যাচ্ছে—এই সব কথা যখন তাঁরা খোলাখুলিভাবে, কিংবা

ছুতোয়-নাতায়, ইঙ্গিতে, ভাবে-ভঙ্গীতে আমাদেরকে শোনান, তখন রক্ত মাথায় চড়ে যায়। তবু যদি তাঁদের সভ্যতার দৌড় কতদূর বিশ্বশুদ্ধ লোকেরা না জানত!

আমি—গুরুনিন্দা শোনা মহাপাপ! ইংরাজ-জাতি খুব সভ্য।

তাঁহারা—ধরুনই তাঁরা খুব সভ্য। তাই বলে তাঁদের সভ্যতা, তাঁদের অনুষ্ঠান আমাদের ঘাড়ে চাপান কেন? ঠিক তাঁদের ছাঁচে আমাদের ঢালাই করা কেন?

আমি—সীডন্‌হ্যাম্ সাহেবও ঐ কথা বলেন বটে। আমার বিশ্বাস কিন্তু অন্য প্রকারের। তাই কি তাঁরা চেষ্টা করছেন? তাঁদের কি ইচ্ছা যে তাঁদের মতনই আমরা সভ্য হই? তাঁদের প্রচেষ্টায় কিন্তু সে ইচ্ছাটি প্রকট হয়নি।

তাঁহারা—খানিকটা হয়েছে। ভাল চাকরী, যশ, মান, অর্থের লোভ দেখিয়েই ত' তাঁরা আমাদেরকে সাহেব ক'রে তুলেছেন! যাঁরাই সরকারী চাকরী করেন, তাঁরাই সাহেবী-ভাবাপন্ন, এবং তাঁরাই সমাজের, দেশের কাছে খাতির পান।

আমি—আচ্ছা চাকরী পায়, না করে?

তাঁহারা—পায় আর করে যাই হোক না কেন, আমরা সাহেব ব'নে গিয়ে সার্থক হব না নিশ্চয়ই। সভ্যতা শুধু ভৌগলিক ঘটনা নয়। সভ্যতা হচ্ছে মানসিক ঘটনা, অর্থাৎ মানসিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের গঠন মাত্র। অতএব গঠন যাই হোক্ না কেন, প্রত্যেক সভ্যতা সেই জাতির পক্ষে প্রকৃষ্ট। আমার খাল না হয় নদী নাই হ'ল, আমার আশপাশের জমিকে উর্ব্বর করতে পারলেই হ'ল, আমার খালের জল সমুদ্রে পড়লেই হ'ল— এই আমরা বুঝি।

আমি—একটু ভুল বোঝেন। আপনাদের মন্তব্যের বিপক্ষে আমার তিনটি আপত্তি আছে। প্রথম আপত্তি—যা হচ্ছে, কি হ'য়ে এসেছে তাই ভাল হচ্ছে স্বীকার করলে বাকীটুকু স্বীকার করতে হয়—যথা, যা করে হোক্ আরো শতখানেক বৎসর যদি ইংরেজ আমাদেরকে পদানত রাখতে পারেন, তা হ'লে পদানত থাকাটাই আমাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণিত হবে। দ্বিতীয় আপত্তি—'প্রকৃষ্ট' আর 'পক্ষে'র মধ্যে বৈরীভাব আছে। কার পক্ষে? আমাদের পক্ষে; আমরাই ত' সভ্যতাকে আমাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট ক'রে তুলেছি। একই জিনিষকে একবার তর্কের খাতিরে static ভাবছেন, আবার function ভাবছেন। সভ্যতা কিছু নিশ্চল নয়, যখন সেটি মানসিক ব্যাপার, তখন সেটি বদলাচ্ছে—তা না হ'লে স্বাধীন হ'তে চাইছেন কেন? অতএব 'আমাদের পক্ষে আমাদের সভ্যতা প্রকৃষ্ট'—এই বাক্যের কোন মানে হয় না। যখন প্রকৃষ্টের কোন উন্নতি নেই, তখন আপনাদেরও উন্নতি নেই। তৃতীয় আপত্তি—আপনাদের স্রোতের যদি জোর না থাকে, খাত যদি গভীর ও ঢালু না হয়, জলে যদি শেওলা ভাসে? তা হ'লে আজ না হয় কাল আপনাদের এই 'প্রকৃষ্ট' সভ্যতাটি মজে যাবে যে!

তাঁহারা—নিশ্চয়ই। কিন্তু সে প্রশ্ন উঠছে না এখানে। প্রশ্ন নয়, কোন্ সভ্যতা ভাল ও কোন্ সভ্যতা মন্দ।

আমি—এতক্ষণ ত' এই প্রশ্নই, অন্তত এই প্রশ্নের মন-গড়া, মন-খুসী করা উত্তরটি মনের মাঝে উঁকি দিচ্ছিল। আমার মনে হয় একটিমাত্র প্রশ্ন আছে—আমাদের জীবনটি স্রোত, না মজাপুকুরের শেওলা-ধরা জল? আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষ

একটি পানাপুকুরের মতন হ'য়ে উঠেছে—অতএব বেনোজলের একটু প্রয়োজন আছে।

তাঁহারা—ঠিক তা নয়, আজ আমরা সকলে এই শেওলা তুলে ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়েছি। বেনোজল ঢোকালে যদি কচুরী পানা চলে আসে?

আমি—স্রোতের জোরে তাও ভেসে যাবে। কাব্য ছাড়ুন। যা বোলেছেন ভাববার কথা বটে। তুলনার সাহায্যে দেশ স্বাধীন হয় না। যা কথা হচ্ছিল তাই হোক। তাঁদের ভণ্ডামি দেখে আপনাদের রাগ হয়; রাগ কমাবেন কি ক'রে? রাগ চণ্ডাল শাস্ত্রে বোলেছে।

তাঁহারা—তাঁদের ভণ্ডামির মুখোস খোলাতে হবে। চিত্তরঞ্জনের এই মত ছিল।

আমি—তাঁর মত নয়, উপায় ছিল, এবং একটি উপায় ছিল। কতদিন তাঁর উপায় তাঁর নাম দিয়ে চালাবেন? নতুন কিছু উপায় বার করুন! তাঁর নাম নিয়ে তাঁর স্মৃতিকে আর অপমান করবেন না।

তাঁহারা—এইখানেই নতুন কংগ্রেসের বাহাদুরী। আমাদের বাহাদুরী আমাদের শান্তিপ্রিয়তায়, কেননা শস্ত্রের উত্তর শস্ত্র হওয়াই স্বাভাবিক।

আমি—মোটে এইটুকু হ'লেই ভণ্ডামির মুখোস সরে যেত! আপনারা ত' শস্ত্রের বিপক্ষে?

তাঁহারা—নিশ্চয়ই, মনে প্রাণে বিপক্ষে। কিন্তু এইখানেই মহাত্মাজীর মাহাত্ম্য। আমরা হ'লাম অহিংস, জৈন। অতএব আমাদের অহিংস অ-সহযোগের উত্তরে যদি তাঁরা শস্ত্রপ্রয়োগ করেন, তা হ'লে দোষটা তাঁদের ঘাড়েই পড়ল। অহিংসার

বিপক্ষে হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করালে তাঁদের প্রকৃত মুখশ্রী টের পাব, এবং তাঁদের মহাজন আমেরিকা টের পাবে।

আমি—দোষী প্রমাণ হ'লে তাঁদের কি ক্ষতি হবে? তাঁদের হাতে খবরের কাগজ, তাঁদের হাতে লীগ্‌ অফ্‌ নেসন্‌স্‌। তাঁরা জীবন্ত জাতি, তেজীয়ান, তেজীয়ানের দোষ হজম করবার ক্ষমতা আছে। যদি তাঁদের ধর্ম্মজ্ঞান না থাকে? আপনারা কি সর্ব্বদাই অহিংস? এই যে বিদেশী পণ্যের বয়কট—এটাও কি অহিংসার লক্ষণ? আচ্ছা তাঁদের মুখোস খুল্‌লেই কি আপনাদের মুখশ্রী ফুটে উঠবে?

তাঁহারা—ও-সব চুলচেরা তর্ক আপনাদেরই শোভা পায়। অবশ্য এও সত্য যে তাঁদের মুখোস খুলে গেলেই, তৎক্ষণাৎ আমাদের মুখ লাবণ্য-মণ্ডিত হবে না। তবে সকলেই জানে যে মুখোস-পরা জুজুর ভয়ে আমরা সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। তাঁদের মুখোস যদি সুন্দরও হয়, তা হ'লেও স্বীকার করা চলে না যে, সে মুখোসের সৌন্দর্য্য আমাদের মুখশ্রীর আদর্শ হওয়া উচিৎ। আমরা নিজেদের মুখ খুলে মুক্ত হাওয়াতে বেড়াতে চাই। একে মুখোস, তায় বিদেশী, আবার না পরলে চলে না, এতে প্রাণবায়ু আর কতদিন বইবে? এই খানেই ইংরেজ রাজার বিপক্ষে আমাদের আপত্তি।

আমি—আমারও আপত্তি বোধ হয় তাই। আপনাদের ভাষাতেই বলি, মুখশ্রী ফোটানই সব চেয়ে বড় কথা। Personality কথাটি এসেছে persona—অর্থাৎ মুখোস থেকে। মুখোস কিন্তু আমাদের একটি নয়, এই যা বিপদ! অতএব আপত্তিও অনেক। এই ধরুন—স্ত্রীপুত্রপরিবারকে একটি বিশিষ্ট উপায়ে ভালবাসতে হবে, ভারতের সমাজে

এক বিশিষ্ট উপায়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে, এক বিশিষ্ট উপায়েই কুশিক্ষিত পিতা, অশিক্ষিত মাতা এবং অর্দ্ধ-শিক্ষিত মাষ্টারের কাছে শিক্ষিত হ'তে হবে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যে বিশিষ্ট উপায়ে অর্থাৎ লক্ষ্মী ছেলেটির মতন আমাদের থাকতে বাধ্য করেছেন—থুড়ী, আমাদের ভাল'র জন্যই উপদেশ দিচ্ছেন, সেই বিশিষ্ট উপায়গুলি অবলম্বন করা ছাড়া আমাদের 'নাস্তি গতিরন্যথা'। এই বাধ্য-বাধকতা কিন্তু ধাতে বসে না—কারুরই না। অথচ সাহস নেই, তাই বনিবনাও ক'রে চলতে হয়—এক কথায় মুখোস পরতে হয়। পৃথিবীতে থাকতে গেলেই বাধ্য-বাধকতা মানতে হবে। কিন্তু মানা অনেক প্রকারের। এক প্রকার মানা হচ্ছে ভীরুতার, আলস্যের নামান্তর। অন্য প্রকার মানা হচ্ছে বাইরের বাধাকে হজম করা, অর্থাৎ ভিতরের তাগিদ ও বাইরের চাপকে হার্ম্মনাইজ করা। যার metacentre ও centre of gravity এক রেখায়, তারই ভারসাম্য আছে। অবশ্য সেখানেই চিরকাল থাকলে চলে না। জীবনের পক্ষে স্থিতির নাম মৃত্যু। জীবনের ভিতরে বাইরে নব নব শক্তির কায চলে। তাই ভারসাম্য সামলাতে সামলাতে, হার্ম্মনি সৃষ্টি করতে করতে চলার নামই উন্নতি। হার্ম্মনি আছে বলেই সত্যকারের মুক্তপুরুষের মধ্যে কোন খিচ্ নেই—যেমন গোরার পরেশবাবু, ঘরেবাইরের মাষ্টারমশাই, ডস্তয়েভস্কির আলিয়শা; ফ্রান্সের আবে কয়নার্ড, সেক্সপীয়রের প্রস্পেরো প্রভৃতি। বিবাদী সুরকে কয়েদ করা চাই, মশাই, নচেৎ সুর খেলে না। ইংরেজ-রাজ্যে বাইরের বাধাকে হজম করা যাচ্ছে না, হার্ম্মনাইজ করা শক্ত হয়েছে। তাই আমার আপত্তি—দেশকে শুষছে বলে, পরাধীন রেখেছে বলে যতটা হোক্ আর না হোক্।

তাঁহারা—যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ী। আমরাও ঐ কথা বলি, তবে একটু সহজভাবে। তবুও একটা সন্দেহ থাকে। আচ্ছা, যা বল্লেন তাই যদি সত্য হয়, তা হ'লে এ দেশে বড়লোকের অভ্যুদয় কি ক'রে হয়? আর যে সে বড়লোক নয়, রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবিবাবু! পৃথিবীর যে কোন দেশ তাঁদের জন্মভূমি হ'লে ধন্য হ'ত। একটু গোলমেলে কথা নয় কি? এক যদি বড়লোকের জন্মগ্রহণ আকস্মিক ঘটনা বলেন, তা হ'লে অবশ্য বোঝা যায়, অর্থাৎ ব্যাখ্যাকে ভগবানের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু আপনার মতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী লোকের মুখে আকস্মিকতার দোহাই শুনতে রাজি নই।

আমি—যে তারাগুলো আকাশে খুব ঝক্‌মক্ করে তারা আকাশের সব কোণেই সমান সংখ্যায় থাকে। বাকি সব ছোট অনুজ্জ্বল তারাই ছায়াপথ সৃষ্টি ক'রে আকাশকে দু'ভাগে বিভক্ত করে। মানসিক জগতের ঠিক ঐ ধরণের galactic latitude পাওয়া যায় না। বড় বড় পণ্ডিত চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করেন। অতএব তাঁদের ব্যাখ্যা ছেড়ে দিন। বিজ্ঞানেও আপাতত বিস্তর আকস্মিক ব্যাপার রয়েছে। বিজ্ঞান আপনারা যতদূর জানেন আর নাই জানেন, বিজ্ঞানের বিপক্ষে আপত্তি, ও বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা কোথায় তা আর আপনাদের বলে দিতে হবে না। বড়লোকের এই দেশে অভ্যুদয় ব্যাপারটা মোটেই গোলমেলে কথা নয় কিন্তু। প্রথমে তাঁদের সম্বন্ধে একটা কথা বলি। ইংরেজ-রাজার অধীনে থেকে তাঁদেরও ক্ষতি হয়েছে। রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবিবাবু বিশ্বের প্রধান

অধিবাসীদের দলে। কিন্তু তাঁরাও ভারতবাসী; যদিও বিদেশী সভ্যতার মুখোস খুলিয়ে তাঁরা আপনাদের কাছে সস্তায় বাহাদুরী নিতে প্রস্তুত হন্ নি। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি অতীব তীক্ষ্ণ। তাই তাঁরা পশ্চিমী সভ্যতার, ইংরেজ-জাতির সভ্যতার মুখশ্রী দেখেছেন—দেখে মোহিত হয়েছেন। এখনও সনাতন-পন্থীরা ঐ তিন জনকে ইংরেজী সভ্যতার 'কুফল' বিবেচনা করেন। অস্বীকার করবেন না। তাঁরা আপনাদের মতন খাঁটি স্বদেশী নন্ বলে আপনারা দুঃখিত। বিবেকানন্দের প্রতি পদ্মনাথ ভট্টের আক্রমণ, রবিবাবুর প্রতি নেতাদের আক্রোশ সত্য ঘটনা। তাঁদেরকে বিপথগামী করতে চেষ্টা করেছেন আপনারা। খৃষ্টান-সম্প্রদায় সম্বন্ধে রামমোহনের মন্তব্যকে, পশ্চিমী সভ্যতাকে বিবেকানন্দের ও কবির চাবুক মারাকে, (এমন কি কবির স্বদেশী গান পর্য্যন্তকেও) আমি তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলতে পারি না। আমি ভাল ক'রে দেখাতে পারি যে, ইংরেজ-রাজার অধীনে থাকার দরুণ তাঁদের শক্তির কিছু অপচয় হয়েছে, কিছু পরিমাণে তাঁদের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটেছে। ইংরেজী ভাষা শিখে তাঁরা ছোট হয়েছেন মহাত্মাজী বলেছিলেন। বাজে কথা! মহাত্মাজীর মাহাত্ম্যও সে হিসাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্বাধীন দেশে তাঁর মাহাত্ম্যের অত প্রয়োজনই থাকত না। বিরোধে শক্তির অর্জ্জন হয়, শক্তি বৃদ্ধি পায়—কিন্তু শুধু বিরোধে আততায়ীর দোষগুলো পর্য্যন্ত এসে যায়—কাঁচপোকা-তেলাপোকার মতনই খানিকটা। আজ যদি ইংরেজ-রাজা না থাকত, তা হ'লে শুধু গান্ধীজীই মহাত্মা হতেন না—আরো দু' দশ জন হতেন, মহাত্মা না হোন, মানুষের মতন মানুষ হতেন। আজ যদি ইংরেজ-রাজা না থাকত, তা হ'লে হয়ত তিনি শুধু প্রাদেশিক অবতারই থাকতেন।

আজ যদি ইংরেজ আধিপত্যকে পৃথিবীর সব জাতি হিংসা না কোরত, তা হ'লে হয়ত আমেরিকান মিশনারী, ফরাসী লেখক, ও বিদেশী শ্রমিকের দল তাঁকে খৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করত না, যুগাবতার মনে করত না। তাতে আমার মতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হ'ত না—বরঞ্চ দেশের লাভই হ'ত। ইংরেজ-রাজের আধিপত্য ও আমাদের দেশের অধীনত্ব তাঁর মহত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে—সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও স্বাধীন চিন্তা করবার শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। আমি তাঁকে আরো বড় দেখতে চাই না। দেশ স্বাধীন কবে হবে জানি না—যদি তাঁর জীবদ্দশায় হয়, তা হ'লে ভয় হয় যে হয়ত তাঁকে ছোট দেখব। যে ব্যক্তি ইংরেজের উপনিবেশে থেকেছেন, যিনি চিরকাল আপত্তিই ক'রে এসেছেন—তিনি স্বাধীন ভারতের অধিবাসীকে স্বাধীন মুক্ত-পুরুষ হবার কতখানি positive সুবিধা কোরে দেবেন জানি না। বিরোধের মধ্যে যতখানি সৃষ্টির বীজ লুকান আছে, ততটুকুরই অঙ্কুর ফোটাতে তাঁর জীবনের আদর্শ সাহায্য করবে—তার বেশী নয়। মহাত্মাজীর কথা তুললাম এই জন্য যে তিনি আমাদের, আপনাদের, ও আমার আদর্শ পোর্ট্রেয়ট। আমি তাঁকে আদর্শ পুরুষ বলি না। আমার, আমার কেন, ভারতের আদর্শ একটু আলাদা। তাঁকে আদর্শ পুরুষ হতে না দেবার জন্য, তাঁকে মহাত্মা তৈরী ক'রে আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য, মানুষের খোঁজে রবিবাবুকে দেশত্যাগী করার জন্য, বিবেকানন্দের ঝাঁজের জন্য, অরবিন্দের পণ্ডিচারী-প্রয়াণের জন্য ইংরেজ-রাজা দায়ী। অন্য অবস্থায় এঁরা প্রত্যেকে first magnitude-এর তারা হয়ত না হতেন—কিন্তু আমরা সকলে nebular

অবস্থায় থাকতাম না, আর বড় ঝকঝকে তারাগুলোও অত দূরে সরে যেত না। ইংরেজ-রাজের অধীনে ভারতবর্ষে যে সব মহাপুরুষ জন্মেছেন তাঁরা হাড়ে হাড়ে জানতেন যে ইংরেজ সভ্যতার কুহক ভাঙ্গা কত শক্ত। সে কুহক ভাঙ্গতে গিয়ে তাঁদের শক্তির অপচয় হয়েছে। অপচয় না হ'লে তাঁরা আরো বড় হতেন। তবে যত অপচয় আমাদের হচ্ছে, ততটা তাঁদের হয়নি বলাই বাহুল্য। তাঁদের অসাধারণত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত।

তাঁহারা—দেখুন, আপনার সঙ্গে আমরা মহাত্মাজীকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। ভূতের মুখে রাম নাম কটু শোনায়। একটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি—গান্ধীজীকে যুগাবতার না মানার জন্যই আপনাদের এই শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ইংরেজের দাস-সম্প্রদায় শীঘ্রই ভারতবর্ষের সমাজ থেকে ধুয়ে পুঁছে যাবে। তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর কৃতিত্ব কি, তাঁর মাহাত্ম্য কতটুকু, এ সব বিচারের ভার ইতিহাসের ওপর দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকব।

আমি—মাহত্ব ও মাহাত্ম্য কি এক কথা? সে যাক্‌গে, একটি উপদেশ দিই, আপনাদের মত দূরদর্শী নই—ইতিহাসকে বিশ্বাস করবেন না, সেই আমাদের হাতে এসে পড়বেন। বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, আপনারা যা করবেন তাই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব ঐতিহাসিকের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। যে কথা হচ্ছিল, ইংরেজ রাজত্বেও বড়লোকের জন্মগ্রহণ সম্ভব হবার কারণ ঐ ইতিহাসের মধ্যেই আছে। তাঁরা সব উনবিংশ শতাব্দীর লোক—সে শতাব্দীতে ইংরেজ রাজার শাসন অত 'ভদ্র' ও ভীষণ ছিল না। গোড়ায় ইংরেজ ব্যবসাদার ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের ফলে এবং পরে তাঁদের রাজ্যশাসন আরম্ভ হ'ল। তখন শাসন-কর্ত্তা ও শাসিতের সম্বন্ধ

ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের। বীটসন্-বেলের নাম শুনেছেন? তিনি যখন বাখরগঞ্জের হর্ত্তাকর্ত্তা তখন একদিন কি একটা নদী পার হচ্ছেন—দেখেন, একটি রুগ্না বালিকা নদী থেকে একটা ভারী কলসীতে জল ভরে নিয়ে যাচ্ছে, ভারী কষ্ট হচ্ছে, সাহেব তখন তাকে মা বলে সম্বোধন ক'রে হাত থেকে কলসী নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দেন। বাড়ী গিয়ে দেখেন যে বালিকার ষণ্ডমার্কা স্বামীটি দাওয়ায় বসে গুড়ুক টানছেন। অমনি চাবুক!

তাঁহারা—অস্থার্থ?

আমি—অস্থার্থ—মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করলেই অনুষ্ঠানের অমানুষিকত্ব অনেকটা লোপ পায়। সিপাই-বিদ্রোহের পর সাহেবরা শাসন করতেন পুরাতন জমিদারের মতন। সেইজন্য সরকারের খাতিরও ছিল খুব। যেখানে শাসন করতে নিজেরা পারতেন না, সেখানে জমিদার দিয়ে শাসন করতেন। তখন ইংরেজ-রাজ বলতে, ভদ্রলোকের কাছে, ইংলণ্ডের সভ্যতা বোঝাত—সেই শেলী, কীট্স, মিল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সর, বার্ক, ব্রাইট, গ্লাডষ্টোন, ডারুইন, হাক্স্লি, ফ্যারাডে। তখন ইংরেজ ছিল ইংলিশম্যান। ইংলণ্ডের রাজনীতি ছিল Little Englander-এর। তা সত্ত্বেও নয়, তারই জন্য ইংরেজ ছিল সত্যকারের মহৎ, ইংরেজের মতনই রাজ্য চালাত। বুয়ার যুদ্ধের পর থেকে, অর্থাৎ গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইংরেজের শাসনপন্থা বদলেছে। ইংরেজ আবার ব্যবসাদার হয়েছে, তবে তাকে ভয়ে ভয়ে ব্যবসা চালাতে হয়, জার্ম্মাণ, আমেরিকান, জাপানী ব্যবসাদারের ভয়ে, পাছে তাদের ভাল কিংবা সস্তা মাল ইংরেজী মালকে তাড়িয়ে দেয়। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি বড়

হ'য়ে গেল, ইংরেজের একছত্র বাণিজ্য-সাম্রাজ্য টলটলায়মান হ'ল। ফলে ইংরেজ হ'ল Imperialist, কিন্তু উপনিবেশের মধ্যে। ওধারে উপনিবেশগুলোও মাথা কাড়া দিয়ে উঠল, সেখানেও দেশাত্মবোধ জাগল, সেখানেও লোক-সংখ্যা বেড়ে গেল, আত্মরক্ষা ও নিজের নিজের আর্থিক উন্নতির জন্য বিদেশী ও বৃটিশ পণ্যের ওপর শুল্ক বসাতে লাগল। ব্রিটিশ পণ্যের ওপর শুল্কের হার কিছু কম। আদৎ কথা, খোলাখুলি ব্যবসা সর্ব্বত্রই গেল উঠে। বাকী রইল ভারতবর্ষ—ইংলণ্ডের কারখানায় কাঁচামাল জোগাবার জন্য। ওধারে নতুন ধরণে রাজ্য চালাবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, তারও একান্ত অভাব ঘটল। 'এমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়'। ভারতবর্ষ হ'য়ে উঠল ''সবে ধন নীলমণি'। তার আদর কত! নীলমণি হ'য়ে উঠল sacred trust! যে রক্ষক সেই হ'ল ভক্ষক। তাই এখন রাজা-প্রজার সম্বন্ধ মানুষের সম্বন্ধ নেই। এ সম্বন্ধ শুধু অর্থলোভের, মুসলমানী যুগের ভোগের কিংবা রাজমহিমালোলুপ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিশেষের নয়। এ যেন শুধু কলের সঙ্গে, কল-কর্ত্তার সঙ্গে মজুরের সম্পর্ক। সেই জন্যই ত' যুবকদলের আন্দোলন একটু socialistic হ'য়ে উঠেছে। তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। এখনকার শাসন-প্রণালী দেখলে Robot-র হাত পা নাড়ার কথা মনে হয়। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহজে নড়ছে না, সব যেন ঝাঁকানি দিচ্ছে। এর মুখের হাসি মুখেরই নয়, মুখোসের। এ হাসির অর্থ ও বীভৎসতা আজকালকার যুবক মনে মনে বুঝেছে ও ঘৃণা করতে শিখেছে। যারা বিংশ শতাব্দীতে জন্মেছে তাদের পক্ষে, এই কলের সম্পর্কে, কলের অধীনে বাস ক'রে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব হয়েছে।

তাই ত' সোণার চাঁদ ছেলেরা সব বিগড়েছে—কেউ ছুঁড়ছে পিস্তল, কেউ শিখছে যোগবল। ও দুটো কাযই সুস্থ, স্বাধীন মনের চিহ্ন নয়। ও দুটো কাযই নৈরাশ্যের, inferiority-complex-এর পরিচায়ক। ছেলেবেলা ভয় কিংবা অন্য কোন ধাক্কা পেলেই মন মুস্‌ড়ে যায়। অথচ মানুষের একটা ego-feeling রয়েছে, যাকে অহঙ্কার বলতে পারেন। অহঙ্কারের সঙ্গে ধাক্কা-খাওয়া, টোল-খাওয়া মনের চল্‌ল লড়াই। হয় ইংরেজ, না হয় ভেতরের কোন রিপু দুর্ব্বলতার প্রতীক হ'ল। তাই তাদের নির্ম্মূল করবার প্রবৃত্তি জন্মাল। বোমা-ছোঁড়ার দলের কিংবা যোগীর দলের অনেকেরই চিত্তের গঠন নিতান্ত দুর্ব্বল। 'স্বদেশী ছোকরা'দের অনেকেরই মধ্যে subnormal, arrested growth কিংবা feeblemindedness-এর চিহ্ন আছে। Point and Counterpoint-এ একটা বৈজ্ঞানিকের চরিত্র আছে, ছেলেবেলায় তার স্বাভাবিক বিকাশের গতিরোধের জন্য সে সোশিয়ালিষ্ট হয়, পরে খুন পর্য্যন্ত করে। বইখানা পড়বেন—অনেক মজার কথা আছে।

তাঁহারা—নায়গ্রার জলপ্রপাতে আমাদের তর্কবুদ্ধি ভেসে গিয়েছে। বইএর কথা যদি তুলেছেন ত' আমরা উঠেছি। কি কারণে কি হচ্ছে জানি না—তবে যা হচ্ছে তা চোখের সামনেই দেখছি। সব কাঁটা হ'য়ে গেল মশাই, ফলে, ফুলে পাতায় পাতায় কেউ ফুটে উঠল না। এ কি কম দুর্ভাগ্যের কথা!

আমি—আরো দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আপনারা ফুল না হ'য়ে কাঁটা হবার কারণ খুঁজছেন না, সেই জন্য ফুল ফোটাবার সুযোগও হচ্ছে না। শুধু 'সকল কাঁটা ধন্য করে কবে গো ফুল ফুটবে?' ব'লে আক্ষেপ করলে চলবে না ত'!

তাঁহারা—দেখুন আপনাকে প্রশ্ন করতে ভয় করে। আবার লম্বা বক্তৃতা দেবেন!

আমি—দেশ স্বাধীন হবে—আপনারা সব মানুষ হ'য়ে উঠবেন—আর ঐটুকুতে ভয়? ভয়েতেই খেয়েছে আপনাদের। সত্য আচার, সত্যনিষ্ঠা, সত্যকথন, সত্যচিন্তা, সত্যজীবন আমাদের যুবকদের পক্ষে অসম্ভব হয়েছে কেন? ঐ ভয়ের জন্য। কেবল ভয়, কেবল ভয়, নিজেকে ভয়, পরকে ভয়। হয়ত জুজু নেই, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই নেই, নিজেরই মধ্যে উন্নতির বীজ রয়েছে—তবু ভয়, আগতকে ভয়, অনাগতকে ভয়। আদিম জাতি যেমন ভয় পেয়ে থাকে, এ তেমনি ভয়, একেবারে elemental, primitive fear—। আমরা মানুষ হিসাবে আদিম, বর্ব্বর। অথচ জাতি হিসাবে আমরা অসভ্য নই, বহু পুরাতন; অথচ, ভয় নিয়ে কোন মানুষ জন্মায় না—ওটা রক্তের সঙ্গে আসে না।

তাঁহারা—আমাদের বিশ্বাস কিন্তু বিপরীত। সব মানুষই ভীতু হ'য়ে জন্মায়।

আমি—আপনাদের বিশ্বাস ভুল। ভয় একটা instinct নয়—nervous হ'য়ে জন্মায় বটে। যে সব শিশু হাঁসপাতালে জন্মেছে তাদের নিয়ে পরীক্ষা করার ফলে দেখা গিয়েছে যে, হঠাৎ কোন জোর শব্দের জন্য, কিংবা হঠাৎ কোন অবলম্বন সরিয়ে নেওয়ার জন্য তারা আঁৎকে ওঠে। এ ছাড়া অন্য কিছুতে শিশুরা বড় ভয় পায় না। ভয় পরে শেখে, ঐ দুই প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়াকে আশ্রয় ক'রে—যাকে conditioned reflex বলা হয়। ভয় ছেলে মেয়েদের শেখান হয়। সে শিক্ষার জন্য বাপ মা'ই দায়ী, শৈশবাবস্থায়

মা ও ঠাকুমার দল, যৌবনাবস্থায় পিতা ও পিতৃস্থানীয়েরা, অর্থাৎ শিক্ষক, অভিভাবকের দল। তাঁরা জীবিত থাকতে দেশের কোন আশা ভরসা নেই। Non-co-operation should begin at home। সত্যকথন, সত্য আচরণ অন্যায়, অবশ্য এ কথা তাঁরা শেখান না। মুখে, কিংবা বিদ্যাসাগর মশাইএর মুখ দিয়ে তাঁরা সত্যের মাহাত্ম্যই প্রচার করেন। কিন্তু শিশুরা, বালক-বালিকারা ভারী চালাক—তারা ঘোরতর realist! বাপ-মায়ের জুয়াচুরী ধরতে তারা ওস্তাদ। বাপমায়ের মনের কথাটি তারা তাঁদের আচরণের এক অঁাচড়েই বুঝে নেয়। 'বিপদের সময় মুখ বন্ধ করাই সমীচীন, গা ঢাকা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ'—এ ধরণের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা তাঁরা সদা সর্ব্বদাই দিয়ে থাকেন। 'ওহে বাপু, নিজের কাজ বুঝে নাও, ধীর হও, শান্ত হও, লক্ষ্মী ছেলে হও'—এ উপদেশ সব বাপমায়েই দিয়ে থাকেন, নিজেদের অভিজ্ঞতার নজীর দেখিয়ে। অবশ্য সবই স্নেহভরে, আমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই, আমাদেরই উপকারের জন্য! আমরা রিসার্চ্চ ছাত্রদের বলি, 'যদি অবশ্য চাকরী পাও, তা হ'লে কথাই নেই'। আমরা এতদূর অপদার্থ যে বশীকরণ ও মতের বমিকরণ ত' দূরের কথা ছাত্রদের কাছে নিজেদের চরিত্রহীনতার অনুকরণ পর্য্যন্ত প্রত্যাশা করি! সদুপদেশের মানে কি? মানে, 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা'।

তাঁহারা—আচ্ছা, আপনার বিশ্লেষণ খানিকটা মেনে নিচ্ছি। যে সব মহাপুরুষদের নাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে আপনার বিশ্লেষণ ঠিক কি না?

আমি—মোটেই না। সেই জন্যই ত' তাঁদের আবির্ভাব এই পরাধীন জাতির মধ্যেও সম্ভব হয়েছিল। একে মূলধন

বেশী, তায় খাটান হয়েছিল ভাল করে, বেশী হারে। তাঁদের শিক্ষা একটু ভিন্ন প্রকারের হয়েছিল। রামমোহন, তিলক, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবিবাবু, গান্ধী, সব বাঘের বাচ্চা! এঁদের চরিত্রে ভয়ের কোন লক্ষণ আছে? তাঁদের কথা ছেড়ে দিন। ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা দৃষ্টান্তস্থল মাত্র। তাঁরা বড় হ'লেই আমরা বড় হব না। দেশের সমস্যা হচ্ছে সাধারণকে বড় করা—উঁচু স্তরে তোলা। বড়লোকের নাম নিয়ে আত্ম-প্রসন্ন হ'তে ভাল লাগে না। সাধারণ-স্তরটি অত নীচু কেন প্রশ্ন করুন আলোচনা করি। আমার বক্তব্য শুনুন।

তাঁহারা—শুধু তাইই ত' শুনছি।

আমি—কিছু ক্ষতি হচ্ছে কি? আমার বক্তব্য হচ্ছে এই—শৈশব অবস্থায় ভীরু, যৌবনাবস্থায় কাজবাগানো ছেলে, প্রৌঢ়াবস্থায় successful man হওয়া সাধনার, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'লে, সত্য কথা কওয়া, সত্য আচরণ করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। যৌবনাবস্থা শেষ হ'লেই গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক সুরু হ'ল। গবর্ণমেণ্ট হচ্ছে বড় সংস্করণের মা-বাপ। তার হাতেই জীবন, তার হাতেই চাকরী, চাকরী ছাড়া গতি নেই, সে চাকরীর মতন খাতির নেই, সুবিধা নেই। অন্য ধারে হাঁড়িতে ভাত নেই, চাষ-বাস করবার মত ধৈর্য্য নেই, ব্যবসা করার মত শিক্ষা, সুবিধা, মূলধন নেই, অন্য কোথাও অর্থসমাগমের সহজ ও সুনিশ্চিত উপায় নেই। তখন মা-বাপ, গুরুজন, শিক্ষক ও পিতৃতুল্য গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা, পরামর্শ ও চাপের বশে সুনিশ্চিতকে বরণ করাই নিরাপদ ও বুদ্ধির চিহ্ন বিবেচনা করাই স্বাভাবিক। নেহাৎ না কি পিতৃমাতৃবৎসল বুদ্ধিমান সন্তান আমরা, তাই পিতামাতা ও পিতৃতুল্য গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা, উপদেশ ও প্রভাবের

বিপক্ষে আমরা মাথা তুলতে চাই না! আমাদের তাতে স্বার্থ ও বুদ্ধিতে ঘা পড়ে যে! কবে আমরা putative এবং political মা-বাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব কে জানে! যতদিন আমাদের দেশের পিতামাতারা জীবিত আছেন, যতদিন তাঁদের আত্মম্ভরিতার জন্য তাঁদের ছাঁচে আমাদেরকে তাঁরা ঢালাই করবেনই করবেন, যতদিন আমাদের শিক্ষক-সম্প্রদায় আমাদের বুদ্ধিমান ক'রে তুলবেনই তুলবেন, যতদিন সাংসারিক সিদ্ধিলাভ অভিভাবকদের চরম লক্ষ্য থাকবে, ততদিন আমাদের কোন ভরসা নেই, ততদিন ইংরেজ ভারতবর্ষে সুখে ঘরকন্না করতে থাকবে। আমাদের গুরুজনেরাই বিদেশী রাজার গুপ্তচর।

তাঁহারা—আপনার মত সমাজদ্রোহী লোক বিরল—অথচ আপনি নিজেকে হিন্দু বলেন!

আমি—আমাদের গোষ্ঠী-জীবনেই নোক্তা পড়েছে। তাই এত গোলমাল। সে গোলমালকে বাড়িয়ে তুলেছে বাইরের লোকে। গোষ্ঠী-জীবন ভাল কি মন্দ জানিনা—কিন্তু আমাদের সমাজে যা দেখেছি তাতে আর শ্রদ্ধা থাকে না। অন্য সমাজে কি আছে, কি নেই, তাতে আমার, আপনার কিছুই আসে যায় না। আমার এক এক সময় ইচ্ছা হয় যে সব উল্টে পাল্টে যাক্, তা হ'লে নতুন শ্লেটে আঁচড় কাটি। সে আঁচড় বাঁদুরে আঁচড় হোক্ না কেন, ঋষিদের হস্তাক্ষর হবে না এই যথেষ্ট, আমাদের শ্রীহস্তেরই লিখন হবে। স্বাধীনতার এক অর্থ বুঝি—সেটি হচ্ছে ভুল করবার স্বাধীনতা।

তাঁহারা—ঋষিদের হস্তাক্ষরের জোরেই বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ টিকে আছে, যেমন গুরুজনদের আশীর্ব্বাদে আপনি এখনও ক'রে খাচ্ছেন। আর সে জন্যই আপনার বক্তৃতা

শুনতে আমরা সমাগত হয়েছি। আজ যদি তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা, কৃপা না থাকত তা হ'লে আপনাকে অন্য জনসাধারণের মতনই কেরাণী হ'তে হ'ত—বই পড়বার, চিন্তা করবার অবকাশ আপনি পেতেন না। আপনার জীবন খানিকটা successful ব'লেই আপনার বাজে বক্তৃতা লোকে সহ্য করে।

আমি—মনের অনেক গোপন কথা ব'লে ফেল্লেন! কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমিও একটি গোপন কথা বলি। আমার মনে কে যেন সর্ব্বদাই খোঁচায়, কে যেন বলে successful হওয়াই চরম কথা নয়, কে যেন বলে জীবনের সিদ্ধান্ত কিছু অঙ্কের সিদ্ধান্ত'র মতন নয় যে উত্তরের পৃষ্ঠা খুলে মিলিয়ে দেখে ঠিক্ হ'লেই পুরো নম্বর পেলাম, কে যেন বলে অনিশ্চিতের আহ্বান শোন, কে যেন বলে সাধারণের দুঃখের ভাগী হও। অবশ্য এ সব গোপন চিন্তার মাথায় লাঠি মারি—তারাও দেবে যায়।

তাঁহারা—বলেন কি! আপনার মতন ব্যক্তিতন্ত্রবাদী কি পরের কথা ভাবতে পারে, অন্যের দুঃখের ভাগী হ'তে পারে?

আমি—আমাকে একটা শিশির ভেতর পুরে, তার ওপর টিকিট লাগিয়ে, তাকের ওপর তুলে রাখবেন না। কোন মানুষকেই একটা শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। সুবিধা, বিশেষত বৈজ্ঞানিক সুবিধার জন্য মানুষের শ্রেণী ভাগ করা হয়, যেমন জার্ম্মাণ পণ্ডিতরা করছেন। আমার বিশ্বাস যে মানুষের স্বভাব ব'লে কোন অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু নেই। সে স্বভাব কোথায় যেন বদলাচ্ছে। কোন রন্ধ্র দিয়ে হাওয়া প্রবেশ ক'রে 'ছোট আমি'র বন্ধঘরের বদ্ হাওয়াকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। জন-সাধারণের শোক-তাপ, আশা-ভরসা 'ছোট আমি'কে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। মানুষের পক্ষে স্বার্থপর থাকা

অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। জগৎজোড়া করুণা এসেছে, করুণা—মশাই, কৃপা নয়, sacred trusteeship নয়। এতদিন, মানুষের ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তিগত স্বার্থের ধারায় চল্‌ছিল। বিপরীত প্রতিক্রিয়ার বশে চেষ্টা হ'ল সব মানুষকে সমান ভাবে দেখতে। অনেকে ভোট পেলে। আরে! তাতে কী হয়! শিক্ষা পদ্ধতি রইল সেই মধ্য যুগের, রক্ত ও বীজ রইল আদিম যুগের। পরে চেষ্টা হ'ল স্বাধীন হবার। পরিণাম, দেশাত্মবোধ। কেননা, সে স্বাধীনতা মানুষের নয়, দেশের—অর্থাৎ শক্তিশালী দেশের দুর্ব্বল দেশকে গ্রাস করবার অবাধ স্বাধীনতা, আর গরীবের ওপর দেশের বড়লোকদের অত্যাচার করবার অবাধ সুবিধা। এখনও চেক্‌রা জার্ম্মাণদের ওপর অকথ্য ব্যবহার করছে, Minority clauses থাকা সত্ত্বেও। তার পর চেষ্টা হ'ল মৈত্রীভাব আনবার। ইদানীং, লীগ্‌ অফ নেসনস্‌ জগতে মৈত্রীভাব আনবার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু আমেরিকা ও বিশেষ ক'রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের Idea of Commonwealth of Nations মৈত্রীভাবের প্রতিকূল হ'য়ে উঠ্‌ল। ঘরের ভিতর ঘর তৈরী হ'ল। মৈত্রী-সাধন শক্ত কাজ, যতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন না হয়। কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে—না হ'লে স্বভাব বদলাচ্ছে সন্দেহ হয় কেন? Liberty, Equality, Fraternity সব বরবাদ্‌ হ'য়ে গেল, শিক্ষার দোষে, এখন বসে আছি Personality-র আশায়। কখনও দেখছি মরীচিকা, কখনও দেখছি বিভীষিকা। একবার মনে হচ্ছে, কার্ল মার্ক্‌সের বাণী মর্ম্মে আঘাত করেছে, যদিও আর্থিক স্বার্থের ভিতর দিয়ে, আবার দেখছি, অত্যাচারী ও প্রপীড়িত দুইএ মিলে অন্যের

ওপর অত্যাচার করছে, সকলকে এক ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করছে, ব্যক্তিত্বকে ও বৈচিত্র্যকে না শ্রদ্ধা ক'রে। একবার আশা হচ্ছে, রাশিয়ার নব্য-শিক্ষাতন্ত্রের ফলে যেমন দশ-পনের বছরের মধ্যেই চাষাভুষোরা মাথা উঁচু ক'রে হাঁটতে আরম্ভ করেছে, সাধারণ মানুষ যেমন হাসতে হাসতে মাঠে-ঘাটে, কলকারখানায়, সভাসমিতিতে কায করছে, স্বার্থকে বলি দিয়েই কায করছে, ভবিষ্যৎ উন্নতির মোহে মোহাচ্ছন্নের মতনই কায করছে, আমরাও তেমনি হয়ত শিক্ষার সাহায্যে মাথা তুলব, শিরদাঁড়া সোজা ক'রে হাঁটব, ঋজু হব, আমাদের রক্ত ধমনীতে জোরে বইবে, কেঁচোর মতন শুধু মাটি খুঁড়েই সার্থক হব না—আমরাও মাটি ছেড়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াব, আমাদেরও মুখশ্রী ফুটে উঠবে। এ সব মাষ্টারী কথাবার্ত্তা শুধু নয়, কাজেরও কথা। আবার বুক কাঁপে এই ভেবে, যে উপায়ে রাশিয়ার মুখশ্রী ফুটে উঠেছে সে উপায়ের ফ্যাসাদ্ অনেক, দাম অনেক, সে উপায় আমাদের ধাতে বসবে না, সে উপায় অবলম্বন করতেই আমরা পারব না।

তাঁহারা—এইবার মাষ্টারী কথা কইলেন! নিজেই বলেছেন যে আপনারা সাবধানী পথিক। কমিউনিজম্ এ দেশে সম্ভব নয় কেন?

আমি—অনেক কারণে। আমি জ্যোতিষী নই। কে জানে আমাদের দেশে কি হবে না হবে? কে জানত' রাশিয়ায় ঐ কাণ্ড হবে? কার্ল মার্ক্সের এক চিঠিতে আছে যে কৃষিপ্রধান রাশিয়ায় স্যোশিয়ালিজমের কোন ভবিষ্যৎ নেই। ইংলণ্ডে ছিল, যেখানে কৃষিকার্য্যও টাকার জোরে capitalised হয়েছে, যেখানে জমিগুলো টাকার জোরে large estate-এ পরিণত হয়েছে, যেখানে খুব কম চাষীরই নিজের জমি আছে,

যেখানে real property এবং national income অত অসমভাবে বিভক্ত, যেখানে ব্যবসা high finance-এর মুঠোর ভেতর, যেখানকার মজুরদল অত ভাল ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ, যেখানে unemployed-এর সংখ্যা অত বেশী। তবু ইংলণ্ড Marxism হজম করলে, ঐতিহাসিক ও ভবিষ্যৎবক্তাকে অপমান করেই। তাই কোন ভবিষ্যৎবাণী করতে নারাজ। কোথা থেকে যুদ্ধ বাধ্‌ল, কোথা থেকে লেনিন্‌ এল, কোথা থেকে Czar-এর গুষ্ঠির ওপর লোক চটে গেল, কোথা থেকে পুরাতন ইতি-হাসের রেকর্ডের ওপর অনাগত, অভাবনীয়, অপূর্ব্বের ছুঁচ পড়ল কে জানে? সে দেশে লোকের হাতে পিস্তল ছিল, প্রপীড়িত হ'লেও তারা স্ববশ ছিল, তাই কর্ত্তাদের হাত থেকে রাজ্য জোর ক'রে তারা নিজেরা কেড়ে নিলে। কমিউনিজমের প্রধান কথা—revolutionary transference of power—মনে রাখবেন। এইখানেই ভিন্ন রূপের সোশিয়ালিজমের সঙ্গে এর তফাৎ। আমাদের দেশে না আছে industrialism, না আছে class-conscious proletariat, না আছে টাকাকড়ির, সম্পত্তির ঐ ধরণের অসম বিভাগ। আমাদের কৃষিকার্য্য চালায় peasant-proprietors-রা, তারা আবার গোঁড়া ধার্ম্মিক। অবশ্য প্রত্যেক কারণটি আলাদা ক'রে দেখলে কিছুই নয়, কিন্তু মবলগ্‌ দেখলে কারণগুলিকে গ্রাহ্য করতে হবে। আমাদের দেশের গ্রামে co-operative spirit-এর ধারা এখনও আছে স্বীকার করি, পাঞ্জাবের 'ভাইচারা' গ্রামের কথাও জানি, কর্ম্মীরা সঙ্ঘবদ্ধও হচ্ছে, দেশও গরীব, ইংলণ্ডও বিপদে পড়েছে, লোকেও উত্তেজিত হয়েছে—সব জানি, কিন্তু revolutionary transference of power কী ক'রে সম্ভব?

হাতে ত কিছুই নেই—সব নিধিরাম সর্দ্দার ! এ আপত্তিগুলো আমার আদৎ আপত্তি নয়। আদৎ আপত্তি হচ্ছে এই—মৈত্রীর নামে, সাম্যের নামে, স্বাধীনতার নামেও আমার personality-কে আমি বলি দিতে চাই না। জোর আমাদের দেশে পূর্ব্ব-য়ূরোপের Green Rising-এর মতন একটা কিছু হ'তে পারে, কিন্তু তাকে communism বলতেই পারেন না।

তাঁহারা—আমরা শুনেছি যে, রাশিয়ায় যে অত্যাচার চলেছিল তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। রাশিয়ার চারিধারে শত্রু, এমন কি উপরেও, ভিতরেও, পাদ্রী ও শিক্ষকসম্প্রদায় ত' চিরকালই সনাতনের দেহরক্ষী ! অতএব যে স্বাধীনতার বলি সেখানে হয়েছে, সেটি ঝুটো স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা vested interest-এর স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা মাত্র। মানুষ কিছু একলা একলা ফুটে ওঠে না, সমাজের মধ্যে বাস করতেই হবে তাকে, তারি মধ্য থেকে তাকে ফুটে উঠতে হবে। সমাজের মধ্য দিয়ে ফোটাই হ'ল আদৎ কথা। অ-সামাজিক ব্যক্তি পশুর সমান। যখন পুরাতন সমাজ-বন্ধন ভেঙ্গে যায়, যেমন বিপ্লবের সময়, তখন মানুষ পশু হ'য়ে যায়। পশুকে ভদ্র করতে কড়া চাবুক চাই।

আমি—লাখ্ কথার এক কথা বলেছেন। ম্যাক্সিম্ গর্কীও বলেছেন যে সোভিয়েটতন্ত্রেই personality-র যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয় ও হয়েছে। সমাজ না হ'লে চলে না। সভ্য, অসভ্য মেয়েরাও সাজ-গোজ করেন অন্য মেয়েদের চটাবার, কিংবা পুরুষের মন ভোলাবার, অর্থাৎ সমাজের জন্য। কিন্তু কিছু রূপ, কিছু যৌবন থাকা চাই ত ? তা দিয়ে ডিম ফোটান যায় মানি, কিন্তু ডিম যদি না থাকে তা হ'লে পণ্ডশ্রম হয় না

কি ? তা' দেওয়াও চাই, ডিমও চাই। ব্যক্তিও চাই, সমষ্টিও চাই। দু'এর কোনটিকে বাদ দিলে চল্‌বে না। সেই জন্য খাঁটি ব্যক্তিতন্ত্র কিংবা খাঁটি সমষ্টিতন্ত্রের দোষ একই। একটি কারণকে একমাত্র কারণ বিবেচনা করা হচ্ছে বুদ্ধির ভট্টপল্লী -মার্কা সতীত্ব।

তাঁহারা—কর্ম্মক্ষেত্রে নামলে অবশ্য একটি কারণের দিকে ঝোঁক দিতে হয়, যেমন আমরা দিচ্ছি। সেটা খানিকটা প্রতিক্রিয়ার জন্য। আমরা সকলেই জানি যে প্রত্যেক কাজের, প্রত্যেক বিষয়ের, প্রত্যেক সমস্যার দু'টো দিক আছে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে গেলেই চোখে blinkers পরতে হয়, কেননা শক্তির অপচয় হ'তে দেওয়া বোকামি। ব্যবহারিক জগতে মানুষের শক্তিকে একটা constant quantity ভাবতেই হয়।

আমি—একটু একপেশে, একটু একগুঁয়ে হ'তে হয় মানি—না হ'লে কাজ করা যায় না, ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়া যায়। এই-খানেই বোধ হয় চিন্তার সঙ্গে কর্ম্মের ধর্ম্মগত পার্থক্য। চোখ খুলে দেখলেই টের পাবেন যে চিন্তাবীররা তাঁদের কর্ম্মবীর শিষ্যবৃন্দের অপেক্ষা সমদর্শী ও সর্ব্বদর্শী। খ্রীষ্ট ঝোঁক দিলেন ওপারের দিকে, সেই সঙ্গে বল্‌লেন, সীজারের প্রতি কর্ত্তব্য কোরো, সেন্টপল ও পোপের দল সব উল্টে দিলেন, এপারের অর্থ, কাম সব অবহেলিত হ'ল। কার্ল মার্ক্‌স ঝোঁক দিলেন অর্থের ওপর, কিন্তু সেই সঙ্গে ব'লে রাখলেন—'আমার তর্কপদ্ধতিটা হচ্ছে হেগেলের, অতএব হে classical economist-এর দল, সামাজিক ইতিহাসের তোমাদেরই ব্যাখ্যানুসারে যে অভিব্যক্তি হয়েছে তারই মধ্যে তার ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে আছে, তাই ত' আমাকে dialectic তর্কপদ্ধতির খাতিরে ইতিহাসের

ইকনমিক্ ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে, labour theory of value গ্রহণ করতে হয়েছে, যদিও তার গলদ্ কোথায় জানি, যদিও মনে করি যে, সে ব্যাখ্যার সঙ্গে ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা মেলালেই ভাল হয়'। তারপর আর সময় হ'ল না। সমাজ বদলাতে লাগল, কার্ল মার্ক্স না খেতে পেয়ে গেলেন মারা। তাঁর শিষ্য এঙ্গেল্স্ ব্যাখ্যার একটু অদল-বদল করলেন বটে, কিন্তু রিফুকর্ম্মটি ধোপে টিক্‌ল না। শ্রমিকের আয় ও সঙ্ঘের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দশা তখন বেড়েই চলেছে। মহাত্মাজীকে আমি চিন্তাবীর বলি না, তবু মহাত্মাজীর উপদেশেরই কতটুকুই বা আমরা গ্রহণ করেছি ?

তাঁহারা—মহাত্মাদের কথা ছেড়ে দিন। বৈজ্ঞানিকরা কি করেন ?

আমি—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে সাধারণের মনোভাব নিয়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে একটি কারণকে স্থিত ক'রে অন্য কার্য্যকে, সুবিধার জন্য, উক্ত কারণের function thereof ভাবা যায়, ভাবতে হয়। কিন্তু এই খানেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ শেষ হয় না। তার পর প্রত্যেক কার্য্যটিকে কারণ ভেবে বাকী কার্য্যকে functions thereof ভাবলেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয়। বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অনুসারে, ব্যক্তিকে ধরে সামাজিক আচার ব্যবহার বোঝাও যা, আর সমাজকে ধরে ব্যক্তিকে বোঝাও তাই। প্রথমে যাকে হোক্ ধরলেই হ'ল, শেষে কিন্তু সব কার্য্য-কারণকেই পরস্পরের দ্বারা বোঝান চাই। জীবন কিন্তু কতটুকু ! তাই মানুষ খাটতে চায় না।

তাঁহারা—আচ্ছা, ব্যক্তি-তন্ত্রের ও সমাজ-তন্ত্রের দোষগুলি বাদ দিয়ে, শুধু তাদের গুণগুলি নিয়ে সমাজ গড়া চলে না কি ?

আমি—সে কি মশাই! এতক্ষণ কী বলছি! মনের কথা ধরতেই পারলেন না? ও দুটো হচ্ছে তন্ত্র, বাদ, মত,—ism মাত্র। মানুষেরই দোষগুণ থাকে। যখন কোন মতকে মানবগঠিত সমাজে খাটান হয়, তখনই সে মতে দোষগুণ বর্ত্তায়। নচেৎ মতের আবার দোষগুণ কি? তবে দোষটি বাদ দিয়ে গুণটি নিয়ে আমরা ক্লাসে এবং কেতাবে নতুন আদর্শ-সমাজের পত্তন করি বটে। না হ'লে আমাদের মোটর-গাড়ী জোটে না। বেঁচে থাক্ সোণা বাঁধান মধ্যপথ, তারই ওপর দিয়ে মোটর চালাই! আদৎ ব্যাপার হচ্ছে এই, কোন্ পরীক্ষকের কি খেয়াল জানা নেই, ছেলারাও জানেনা, অথচ, নতুন কিছু খাড়া করা চাই। একটি বিশিষ্ট মতের ওপর জোর দেওয়া, তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা, তার সংক্রান্ত সব বই পড়া হচ্ছে নিতান্তই মামুলী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। আগেকার অধ্যাপকেরা তাই করতেন, কেউ ছিলেন মিলের গোঁড়া, কেউ কোম্তের, কেউ হ্যামিল্টনের। নতুন ঢেউএ গোঁড়ামি চলে গিয়েছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ হ'তে বলছে। কি করা যায়? ছেলেরা ফেল্ করলে, নতুন সমাজ না গড়লে চাকরী যাবেনা বটে, কিন্তু বদনাম হবে, বেশী ছেলে আমার বিষয়টি নির্ব্বাচন করবে না। তাই মধ্যপথ! স্যাড্‌লার রিপোর্টের আশীর্ব্বাদে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় জন্মেছে তার সুফল, কুফল আপনাদের অবিদিত নেই। নিজের ঢাক নিজেকেই পিট্‌তে হচ্ছে, এক একটি ডিপার্টমেণ্ট অন্যের সতীন বললেও অত্যুক্তি হয় না! দুঃখের কথা ছেড়ে দিন! তাই যখন কলেজ থেকে বাড়ী ফিরি তখনই মানুষ হই। যখন মানুষ হই, তখন একলা একলা অনেক কথা ভাবি।

তাঁহারা—কি ভাবেন জানতে পারি কি ?

আমি—সে অতি গোপন কথা। অনেক কেতাবেই লেখা আছে, আমি যা ক'রে বলতে পারব তার চেয়ে ভাল ক'রেই বলা আছে। নিজেও লিখেছি একটা কেতাবে। দেখুন, সকলেই ব্যক্তি ব'লতে ভিতরের বস্তু, সমাজ ব'লতে বাইরের বস্তু বোঝেন। এই তথাকথিত ভিতর ও বাইরের মধ্যে, বাইরে, পিছনে, সামনে, ওপরে, নীচে একটা continuum ওতঃপ্রোত হ'য়ে আছে, যেটি ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে concrete, কিন্তু যার স্বভাব হচ্ছে universal—বুঝলেন কি না জানি না। যতদিন না বুঝবেন ততদিন স্বরাজ-সাধনার কোন অর্থ নেই। continuum-কে বৈজ্ঞানিক ভাবে ধরবেন না। বিজ্ঞানের সব রেখাই বিচ্ছিন্ন। পদার্থ-বিজ্ঞানের ঘটনা, আর মানসিক ঘটনা এক জাতের নয়, শেষের ঘটনা পূর্ব্বোক্ত ঘটনার তুলনায় অবচ্ছিন্ন। সে অনেক কথা ! এই continuum-কেই personality বলা হয়। স্বরাজ-সাধনা মানে একে ব্যক্ত করা, ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া, অর্থাৎ প্রত্যেকের মুখশ্রী ফুটিয়ে তোলা। যদি আপনাদের মতে কিংবা উপায়ে স্বরাজ পেলে এর কোন সুবিধা হয়, তবেই সে মত ও উপায়ের মূল্য আছে। নচেৎ ইংরেজের অধীনে নেহাৎ মন্দ নেই।

তাঁহারা—মানুষ হ'য়ে এই কথা ভাবেন না কি ? আচ্ছা, কি ক'রে personality স্বাধীন ভারতে ফুটে উঠবে ?

আমি—তা জানিনা। যে উপায়ে সাধন করবেন তারি উপর খানিকটা নির্ভর করে না কি ? তবে এ কথাও ঠিক্ যে স্বাধীন ভারতে, অভিজাত-সম্প্রদায়ের, না জন-সাধারণের প্রভুত্ব, ধনীর, না শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রভুত্ব চল্‌বে—এই সব ভেবে-চিন্তে,

অঙ্ক ক'ষে যদি স্বরাজ-সাধনা সুরু করেন, তা হ'লে আপনাদের ইচ্ছা হয়ত ফলবতী হবে, কিন্তু আপনাদের মুখশ্রী ফুটবে না। যদি এই মনে ক'রে কাজ করেন যে, একটা বড় গোছের নির্দ্দোষ system গড়ে তুলবেন যেটি আপনাদের ঐতিহ্যের কাঠামোর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে কিংবা পশ্চিমী-সভ্যতার অনুকৃতি হবে, তা হ'লে কিছুতেই personality-র সুবিধা হবে না। বলা বাহুল্য, আমার কোন বিশেষ system-এর বিপক্ষে আপত্তি নেই—কেননা বুদ্ধি দিয়ে ইমারৎ খাড়া করাই আমার পেশা। তবে কি জানেন, What are the merits and demerits of unitary and federal governments ধরণের প্রশ্ন পরীক্ষকরাই ক'রে থাকেন, পরীক্ষার্থীরাই উত্তর দেন। পরীক্ষক-পরীক্ষার্থীর সম্বন্ধটি অমানুষিক সম্বন্ধ। মণ্টেগু রিপোর্টের ওপর কবি গোটাকয়েক মন্তব্য করেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল যে, এই রিপোর্টের ফলে সমগ্র ইংরেজ-জাতি হ'ল পরীক্ষক এবং সমগ্র ভারতবাসী হ'ল পরীক্ষার্থী, পরীক্ষা হবে দশ বছর পর, অতএব এর মতন অপমানসূচক সম্বন্ধ মানুষের পক্ষে দুটি নেই। আজ আপনাদের নেতারা সকলে কবির কথাই কপ্‌চাচ্ছেন। আপনাদের সঙ্গে-আমার সম্বন্ধ আরো মধুর—তাই, কি ক'রে, কোন বিশিষ্ট উপায় গ্রহণ করলে মুখশ্রী ফুটে উঠবে, এ সব ছেলে ঠকানো প্রশ্নের কোন জবাব দেবোনা। দেখুন, প্রশ্ন করা আমাদেরই অভ্যাস, জবাব দেওয়া নয়। তা ছাড়া, আপনারা মানুষ, আপনাদের মনুষ্যত্বকে অপমান করতে চাই না। অবশ্য আগে থাকতে ভেবে, অঙ্ক ক'ষে ভবিষ্যৎ গতি নিরূপণ করা বুদ্ধির বিজ্ঞান-সম্মত কাজ বটে, কেননা বিজ্ঞানের একটি কাজই ভবিষ্যৎবাণী করা। কিন্তু সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কারা বই

লেখেন? যাঁদের টাকার দরকার এবং যাঁরা বৈজ্ঞানিক নন—যেমন Lord Birkenhead। কিন্তু আমরা স্কলার, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। আমাদের চারণ-ভূমি অতীত, আমাদের রোমন্থন একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জোর বলা যায়—এতদিন সমাজ এমনিভাবে চলে এসেছে, নতুন ঘটনা ঘটছে না—অতএব আশা করা যায় যে, আরো কয়েকদিন এমনিভাবে সমাজ চলবে। বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে, বর্ত্তমানকালে, এক আশা করা ছাড়া সামাজিক ভবিষ্যতের জন্য অন্য কিছু কাজ করতে পারেন না—অবশ্য অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পারেন বটে।

তাঁহারা—আমাদের স্মরণ হয় যে, আপনি একদিন বলেছিলেন 'বুদ্ধিকে খাটানোই সভ্যতার প্রধান কাজ।'

আমি—উল্টো কথা বলা আমার অভ্যাস। অনেক সময় ডিগ্‌বাজী খেয়ে পৃথিবীকে দেখতে হয়। লোকে যখন মনে করে এবং বলে যে সে চিন্তা করেই কিছু করছে, তখন দেখি সে চিন্তা ভাবালুতারই নামান্তর, হয় কেবল unconscious cerebration, আর না হয় ধরতাই বুলি আওড়ান। সব চিন্তার মধ্যেই ভাবের খাদ মেশান থাকবে, ভাবের রীতিই হ'ল suffuse করা—কিন্তু শুদ্ধচিন্তার মধ্যে অবচেতনা কিংবা ভাবপ্রবৃত্তির স্থান সঙ্কীর্ণ, তাড়না সংযত, নেই বল্লেই হয়। খাঁটি চিন্তার জন্য একটু নিষ্কাম হওয়া দরকার—যেমন পাঁকাল মাছ! কাদার মধ্যেও একটু আলাদা থাকতে হয়। কবিদের ত' ভাবপ্রবণ বলেন আপনারা—কিন্তু খাঁটি কবি কতখানি আলাদা থাকেন দেখলে তাঁকে নিষ্ঠুর বলবেন। 'জয় মা' বলে কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে প'ড়লে জীবনকে আর্ট হিসাবে দেখা যায় না। মহাত্মাজী

সোমবার কথা কন্ না, মধ্যে মধ্যে জেলে যান ব'লে তিনি নেতাদের মধ্যে একজন ভাল আর্টিষ্ট। আমি যে ঝুলে পড়িনি তার কারণ অবশ্য আমি শুদ্ধভাবে চিন্তা করি তা নয়। আমার দোষ হ'ল—ভয়, অক্ষমতা, অধৈর্য্য, রাগ।

তাঁহারা—তা হ'লে চিন্তা না করাই ভাল ?

আমি—তা নয়। চিন্তা না ক'রে বাঁচাই যায় না। তবে কিছু আগে থাকতে চিন্তা করাই ভাল। কিন্তু মাথা গজাবার আগেই মাথার ব্যথা হচ্ছে যে আপনাদের! চিন্তার কাজ clabora-tion of a topic—। কোন বিষয়, কি ঘটনা ঘনীভূত হ'য়ে topic হবার পূর্ব্বেই তাকে বিশদ করা যায় না, কেন না চোর পালাবার পরই চিন্তার ক্রীড়া সম্ভব, যথা পুলিশ ও ঐতিহাসিক। আমরা কেউই পুলিশের চেয়ে বুদ্ধিমান নই! যদি হই, তবে কাজের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা চলা চাই, এবং সেজন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া কিংবা খেলোয়াড়ের মতন। অর্থাৎ কিনা, আলোচনার দ্বারা মস্তিষ্ক পরিষ্কার রাখতে হবে, কর্ম্মের দ্বারা ইচ্ছা-শক্তিকে উন্মুখ, সজাগ, সবল রাখতে হবে, কল্পনাকে সদভ্যাসের দ্বারা তীক্ষ্ণ রাখতে হবে। এই হ'ল আমার মত বুদ্ধিজীবির এক-মাত্র স্বরাজ-সাধনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে সজাগ হ'য়ে থাকলে বাকি সবই সম্ভব হয়, হয় না শুধু ইচ্ছাশক্তির বিকাশ, চরিত্রের গঠন।

তাঁহারা—কই আমরা ত' কখনও শুনিনি যে দেশ স্বাধীন হচ্ছে, আর বুদ্ধিজীবিরা বুদ্ধিকে শুধু শানই দিচ্ছেন! সত্য কথা বলুন না, আপনারা কাপুরুষ!

আমি—তা হ'লে মিল্‌টনও কাপুরুষ ছিলেন, Masaryk, Padereweski-ও কাপুরুষ! মিল্‌টনের সে লাইনটা মনে আছে ? They also serve who only stand and wait,

অপেক্ষা করলেও সেবা করা যায়, মানুষ একেবারে অকর্ম্মণ্য হয় না। যাঁর কর্ত্তব্যজ্ঞান অত প্রবল ছিল, যিনি নিজেকে Taskmaster-এর সামনে সর্ব্বদাই রাখতেন, তিনিও প্রথমে কবিতা লিখতেন। পরে, বিবাহ-জীবনের আস্বাদ পেয়ে, কিংবা দেশের দুরবস্থা দেখে কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপ দিলেন। কেরাণীগিরি, pamphleteering সবই তাঁকে ক'রতে হয়েছিল। আপনারা ব'লবেন শুধুই দেশের ডাক—আমি ব'ল্‌ব, একধারে দেশের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান, অন্যধারে ঘরের বিকর্ষণ, একেবারে নিউটনের তৃতীয় নিয়ম! শেষে আবার সেই কবিতা, এমন কি অন্ধ হ'য়েও। তবে, হাত আর জমল না। এ যুগের Padereweski পিয়ানো বাজাতেন, পরে প্রেসিডেণ্ট হ'লেন, শেষে আবার পিয়ানোর ডালা খুললেন, তাঁরও হাত আর জমল না। উইল্‌সন, ম্যাসারিক্‌, বেনেস্‌ অধ্যাপক ছিলেন। এঁদের গার্হস্থ্য-জীবনের ইতিহাস আমার জানা নেই। এ সব ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য্য বুঝলেন? তাৎপর্য্য হ'ল—দেশের ডাক কবে আসবে তাই শোনবার জন্য সব ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করার দরকার নেই; গোড়া থেকেই, সাহিত্য, সঙ্গীত, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি বাজে কাজ বন্ধ করা অন্যায়; বরঞ্চ ঐ সব বাজে কাজ ক'রে মস্তিষ্ক, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তি তৈরী রাখাই বুদ্ধিমান দেশসেবকের একান্ত কর্ত্তব্য। দেশের কাজ এল, ডাক এল, সেই তৈরী মাথা, হৃদয়, ইচ্ছাশক্তিকে দেশের কাজে লাগান গেল। দেশের কাজ বন্ধ হ'ল, কিংবা সাধনা অন্য ধারায় প্রবাহিত হ'ল, নিজেকে সরিয়ে নিলাম, নিজের কাজের জন্য। নিজের personality-কে ক্ষুণ্ণ হ'তে না দেওয়াই পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য্য।

তাঁহারা—আর তাৎপর্য্য শুনে কি হবে? সবই ত' আপনার ব্যাখ্যা!

আমি—তা ছাড়া নোট্‌মেকারের হবে না কি? তাৎপর্য্যের অর্থ সরলভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি—তাৎপর্য্য হচ্ছে always in relation to my personality, which is unique and concrete with reference to my individuality, and universal with reference to the potentiality of my creative impulse or self, working itself through and out of the given environment, physical, mental and social,—এইবার বুঝলেন ত'?

তাঁহারা—জলের মতন! ইংরেজের অধীনে থাকার সঙ্গে এ সব মন্তব্যের কতটুকু কুটুম্বিতা?

আমি—ভাষার কুটুম্বিতা, ভাবের নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে—ইংরেজ রাজার অধীনে আমার জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্য মোটেই ফুট্‌ছে না। এক কথায়, আমার মূল্য-জ্ঞানের ব্যাস বেঁকে গিয়েছে, যেমন পৃথিবীর অক্ষ ও ব্যাস বেঁকে গিয়েছিল আদম-ঈভের পাপে। ইংরেজ রাজার অধীনে, বর্ত্তমানে, আমাদের জীবনের একমাত্র মূল্য—আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সিদ্ধি ও সার্থকতা। দিব্যি খাবোদাবো, আপনাদেরও মাঝে মাঝে, বক্তৃতা শোনাবার পর, খাওয়াব দাওয়াব, মোটর চড়ব, চড়াব, স্ত্রীকে উপহার দেবো, আপনাদের স্ত্রীরা যদি হত-কুৎসিত না হন, কিংবা চায়ের নিমন্ত্রণ ক'রে আমাকে গান কি এস্রাজ বাজান না শোনান্, কবিতা ও গল্প না লেখেন, তা হ'লে তাঁদেরকেও গোপনে উপহার দেবো, ছেলে-জামাই, ভাই-ভাইপো, আত্মীয়-স্বজন সব বড়লোক হবে, বড় চাকরী ক'রে দেবো

কিংবা কোরবে—এই আমরা চাই। অতএব এখন কর্ত্তব্য হচ্ছে মূল্য-জ্ঞানকে সোজা, ঋজু করা। তার ফলে টাকা কমবে না, টাকার সদ্‌ব্যবহারই হবে।

তাঁহারা—ঠিক্ ঐ জন্যই মনের কুড়েমী ও ভয় ভাঙ্গতে হবে, পরনির্ভরশীলতা ভাঙ্গতে হবে, কাপুরুষতা ঘোচাতে হবে। আমরা জেলে গিয়ে ঐসব দুর্ব্বলতা ভাঙ্গব।

আমি—বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু আমি জেলে যেতে পারব না। আপনারা শুধু নেতির দিকেই দেখছেন। আমি একটু ইতিবাদী, কথার বেলা নয় অবশ্য।

তাঁহারা—নেতি-ইতির মধ্যে কোন ব্যবধান নেই।

আমি—ব্যবধান নিশ্চয়ই আছে। সে ব্যবধানকে no-man's land ব'লবেন না—কেননা সেই স্থানটিই প্রকৃত base of operations। সেইখানেই সিদ্ধান্ত সব আট্‌কে রয়েছে, যাকে suspended belief কিংবা judgment ব'লতে পারেন—দানা বেধে মিছ্‌রী হচ্ছে না। এইখানেই শুদ্ধসত্তা ও শুদ্ধচিন্তা সম্ভব, একমাত্র যার দ্বারা স্বদেশী লোক স্বাধীন হবে, পরের মুখোস খ'সে যাবে, নিজের মুখশ্রী ফুটে উঠবে।

তাঁহারা—ঐ no-man's land-এই ত' সৈনিকরা মুখোস পরত!

আমি—না, এইখানেই গোরা তার প্রকৃত পশু-স্বভাব দেখাত, সভ্যতার মুখোস খুল্‌ত।

তাঁহারা—সে যাই হোক্, শুদ্ধসত্তা অর্জ্জন ও শুদ্ধচিন্তা করার উপদেশ আপনার মুখে শোভা পায় না। আপনার ভাবগুলো বড়ই এলোমেলো, আপনার সত্তার মধ্যে সত্ত্বগুণের নিতান্ত অভাব। আপনার মধ্যে আছে তমোগুণ ও রজোগুণ

কয়েকটা, যাদেরকে আমরা অহঙ্কার বলি।

আমি—বাংলা মাসিক-সাহিত্যের জন্য কিছু রেখে দিন! 'বোঝে প্রাণ আছে যার'। ধনুকের জ্যা হ'য়ে থাকুন, টঙ্‌ ক'রে বাজুন, শীকার পেলেই, অনুকূল হাওয়া বইলেই, বাঁই ক'রে ছুটে যাবেন। তবে ঋষিবালকদিগকে মারবেন না, এইটুকু দেখবেন। কেন না আত্মশক্তির অপচয় শুধু পাপ নয়, মস্ত গোস্তাকি।

তাঁহারা—আপনার কথামৃত শুনে আমরা কৃতকৃতার্থ হলুম। অনেক শক্তি সঞ্চিত হ'ল। কিন্তু প্রশ্নের জবাব পেলাম না।

আমি—'বিশ্বাসে মিলিবে উত্তর, তর্কে বহুদূর'।

তাঁহারা—কোন্ বৈজ্ঞানিকের উক্তি ?

আমি—একা অলিভার লজের নয়, বোধ হয়। দেখুন, আমি কথোপকথন ঠিক পারি না। আমি কইব উপকথা, আর আপনারা কইবেন কথা, এ কর্ম্মবিভাগের বন্দোবস্তে আমি রাজি নই। আমি পারি কথকতা ক'রতে। দেশোদ্ধার জ্যামিতির problem নয় যে, Q. E. D. লিখে সমাপ্ত ক'রব।

তাঁহারা—এবার নিজের কথা আরম্ভ করেছেন, উঠি।

আমি—গোড়াতেই বলেছি প্রত্যেকে নিজ নিজ হোন। আপনারা নিজের মত হ'তে পারলেন না, তাই ত' আমাকে নিজের কথা কইতে হচ্ছে। Thought is repressed action জানেন ত'? আর নিজের কথা কইব না ত' পরের ধার করা ধরতাই বুলি আওড়াব না কি ? আপনারা ত' ছাত্র নন্।

তাঁহারা—তবু যদি নিজের কথা হ'ত!

আমি—ঐ যাঃ, সব জুয়াচুরী ধরে ফেল্লেন! আমার মুখোস খোলালেন! আজ তা হ'লে নমস্কার! কাল যদি পদধূলি দেন!

তাঁহারা—আবার!

ষষ্ঠ স্তবক—স্ত্রী-পুরুষের কথা

কিন্তু, কিছুদিন পরেই তাঁরা এলেন। গল্প সুরু হ'ল।

তাঁহারা—দোহাই আপনার, আজ একটু হাল্‌কা, বাজে কথাবার্ত্তা হবে।

আমি—তথাস্তু। কিন্তু, 'অন্ন জুটিবে কেমনে'? কুচ্‌ পরোয়া নেই—আপনারা অত স্বার্থত্যাগ করছেন, আর আমি এতটুকু পারব না! আচ্ছা, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ আলোচনা করলে কি হয়? বাড়ী খালি।

তাঁহারা—চমৎকার বিষয়! কিন্তু বিষয়-নির্ব্বাচন ক'রে কি কথাবার্ত্তা হয়? ভদ্রলোকে যখন স্ত্রীজাতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ নিরূপণ করেন, তখন নিতান্ত গম্ভীর হ'য়ে যান—তাই একটু ভয় হচ্ছে!

আমি—অভয় দিচ্ছি। কিন্তু গোড়াতেই ভুল করেন কেন? স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, আর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, এ দুটি হ'ল আলাদা বিষয়। প্রথমটি নিয়ে, সাধারণত, দুই পার্টিই দায়িত্ব শূন্য হ'য়ে ঠাট্টা তামাসা ক'রে থাকেন—কিন্তু দ্বিতীয়টি নিয়ে অনেকেই কথা কন্‌ না, কিংবা যখন কথা কন্‌, তখন সমাজের ভয়ে, লোকনিন্দার ভয়ে কিংবা ভদ্রতার খাতিরে দু' পার্টিই নিতান্ত গম্ভীর হ'য়ে যান। প্রবন্ধের বেলা আলাদা।

তাঁহারা—যা ব'লেছেন! প্রবন্ধ নিয়েই ব'লছি। স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে নলিনী গুপ্তের লেখাই বলুন আর আশালতা দেবীর লেখাই বলুন, সবই খুব শক্ত ও গুরুগম্ভীর।

আমি—নলিনীবাবু সব জিনিষই একটু গম্ভীরভাবে দেখে থাকেন। তাঁর 'ত্রয়ী'-ফর্‌মূলার মধ্যে সব আন্‌তে হবে ত'! মেয়েদের দোষ দিই না। স্ত্রী-সাহিত্য পুরুষ-সাহিত্যের অনুকরণ হ'তে বাধ্য, যতদিন স্ত্রী-শিক্ষা পুরুষ-শিক্ষা, অর্থাৎ পুরুষের অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অনুকরণ হ'য়ে থাকবে—এবং যতদিন সাহিত্য 'শিক্ষা'র ওপর নির্ভর ক'রবে। মেয়েদের মধ্যে যাঁরা ইংরাজী জানেন না, ফরাসী জানেন না, সংস্কৃতের ধার ধারেন না, এমন কি বাংলা পর্য্যন্ত যাঁরা শেখবার মত শেখেন নি, তাঁদেরই লেখায় কদাচ কখনও মেয়েলী ছাঁচ ও ছাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, নচেৎ সবেরই এক ঢালাই! অতএব স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে লেখিকাদের আলোচনা যে নেহাৎ পুরুষালী হবে সে আর বিচিত্র কি? আশালতা দেবীর লেখার মধ্যে অবশ্য সাহিত্য-রস আছে।

তাঁহারা—স্ত্রী-সাহিত্য ও পুরুষ-সাহিত্য দুটো আলাদা বস্তু নয় কি?

আমি—বস্তু হয়ত একই। কিন্তু মানুষে যখন লেখে—জীবন-দেবতা কিংবা dæmon-এ যখন লেখে না, তখন লেখার রূপ ভিন্ন হ'তে বাধ্য। সাহিত্যে রূপের ভাগটাই বেশী চোখে পড়ে, তাই পার্থক্যটাই বড় মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে পাঠকের ওপর প্রভাবের দিক থেকে পার্থক্যটাই প্রধান কথা হয়ত সব সময়ে নয়। আমাদের দেশের মেয়েদের লেখা নিয়ে পুরুষদের মন্তব্য পড়লে জন্‌সনের dancing dog-এর ওপর মন্তব্যের কথা স্মরণ হয়। মেয়েরা আমাদেরকে গম্ভীরভাবে নিচ্ছেন এই দেখলেই হৃদয় আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় এতটাই পরিপ্লুত হয় যে, প্রকাশ-ভঙ্গী এবং বক্তব্য নিয়ে বিচার করাই

অমানুষিকতা ও অসভ্যতা ব'লে ঠেকে।

তাঁহারা—সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলে?

আমি—স্ত্রীজাতির স্ত্রী হবার যোগ্যতা নিয়ে পুরুষেরা যা কথা কন তা কইবার ও শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে—কিন্তু পুরুষের স্বামী হবার যোগ্যতা নিয়ে স্ত্রীরা যা কথা কন তা শোনবার ভাগ্য ঘট্‌লেও তা নিয়ে তর্ক করার সুবিধা কখনও হয়নি। আজকালের ছেলেদের মুখে দুটি বিষয়ের আলোচনা শুনি—এক অর্থশাস্ত্রের, অন্যটি কাম-শাস্ত্রের। তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনে তাঁদের মনোভাব যতদূর বোঝা যায়, তাইতে মনে হয় যে ব্যাপারখানা ঘনিয়ে উঠেছে। কেউ আর হাল্‌কাভাবে কিছু দেখতে পারছে না। মেয়েরা আমাদের শুধু জীবন-সঙ্গিনী নন্—তাঁরা আমাদের জীবন্ত সমস্যা—live problems। বিরোধ বেশ জমে উঠেছে। অথচ এ কথা ঠিক যে, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ সহজ ও সরল হ'লেই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সুন্দর হয়। বিরোধই বোধ হয় সকল সম্বন্ধেরই রীতি—এই ভেবে জড়ভরত হ'য়ে আছি।

তাঁহারা—বিশ্বাস করি না। আপনি দেখছি একেবারে খৃষ্টান,—original sin না মানলে আপনি দেখছি কিছুতেই শান্তি পান না! বিরোধই যদি সব সম্বন্ধের মূলকথা হ'ত, তা হ'লে জীবনটা কত একঘেয়ে হ'ত বলুন ত'?

আমি—আমাদের বোঝবার, ও তার চেয়ে দরকারী কাজ আপনাদের বোঝাবার কত সুবিধা হ'ত বলুন দেখি! আর সেই জন্যই ত' Freud-এর অন্তত একটি শিষ্যের জয়গান করি! আমাদের সমাজ-তত্ত্ববিদেরাও ঐ ধরণের অনেক মন্ত্র দিয়ে

গেছেন, একটি মন্ত্র জপ করুন—ব্যস্, মোক্ষলাভ হাতে হাতে! এটি পছন্দ না হয়, উল্টোটা নিন্!

তাঁহারা—বিরোধ সব ক্ষেত্রে থাক্‌লে তার প্রতীকারও এতদিনে আবিষ্কৃত হ'ত।

আমি—আবার নেই নেই ক'রে সাপের বিষও উড়িয়ে দেওয়া যায়।

তাঁহারা—বিরোধের সঙ্গে মিলন মিশ্রিত আছে।

আমি—অসহযোগ আন্দোলন প্রেমের কলহ ব'লে সবই প্রেমের ঝগড়া নয়। লরেন্সের নায়ক-বৃন্দ······

তাঁহারা—নাম না ক'রে থাকতে পারেন না?

আমি—পারি না। শুনুন,—লরেন্সের নভেলে প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া থাকে—কিন্তু সে ঝগড়ার পরিধি বড় ব্যাপক —সেখানে প্রথমে দেখবেন একটি জোড়, অর্থাৎ একটি স্বামী, অন্যটি স্ত্রী। সম্বন্ধটি নিতান্তই ঘরোয়া। পরে এই ঘরোয়া সম্বন্ধ বড়ই আটপৌরে হ'য়ে উঠ্‌ছে দেখতে পাবেন! কারণ আর কিছুই নয়—নায়ক স্বামী, স্ত্রীকে আর স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধের prism-এ দেখছেন না—দেখছেন, স্ত্রী-পুরুষের সাধারণ, বৃহৎ ও নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের সাদা কাচের মধ্য দিয়ে। আগে ছিল ঝগড়া, ঝটাপটি এবং তার পরেই দৈহিক মিলন; এখন আর তা নয়—একজন গেলেন পালিয়ে, আর একজন থেকেই গেলেন। যদি বা একত্র বসবাস করতে লাগলেন তাও বিদ্যুৎ-ভরা দুটো কাছাকাছি মেঘের মতন। Atmosphere নিতান্ত sullen হ'য়ে উঠল।

তাঁহারা—ঐ রকম abstract ভাবে দেখলেই ত' বিপদের আশঙ্কা! আমরা জোর ক'রে বলতে পারি যে লরেন্স ঠিক ঐ

জন্যই বড় আর্টিষ্ট নন্—নিশ্চয়ই তাঁর কেতাবের আবহাওয়াতে পাঠকের দম বন্ধ হ'য়ে যায়! আমরা লরেন্স পড়িনি, গলস্‌ওয়ার্দ্দি পড়েছি—তিনি খাসা লেখেন।

আমি—নিশ্চয়ই। তিনিও আইরিণী ও সোম্‌স্‌ সৃষ্টি ক'রেছেন! তবে তিনি খাঁটি ইংরেজ কিনা, তাই খানিকটা সেন্টিমেণ্টাল্। সে যাক্ গে! আপনাদের কথা খানিকটা মানি। মানুষ হিসেবে দেখলে অশান্তি লোপ পায়, অন্তত পেতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসেবে দেখবার জন্য বিস্তর সাধনার প্রয়োজন; সর্ব্বভূতে নারায়ণ দেখবার সাধনার চেয়েও কষ্টকর। তান্ত্রিক সাধনার একটি অঙ্গ স্ত্রী-জাতিকে শক্তি হিসেবে দেখা। সেটাও abstract নয় কি? অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন-মাধুর্য্য আছে। কিন্তু যতটুকু মিলন, ততটুকু তর্ক ও আলোচনার বাইরে। সেটা মফঃস্বল, অর্থাৎ প্রাইভেট। যতটুকু বৈপরীত্য ততটুকুই সমস্যা, এবং সেই সমস্যার সমাধানের জন্যই আলোচনা।

তাঁহারা—ও রকম ভাবে ভাগ করেন কেন?

আমি—বাস্তব-জীবনে ভাগ রয়েছে ব'লে। ভাগ না ক'রলে মানে হয় না, অন্তত সে মানে বুঝি না।

তাঁহারা—জীবনের সমগ্র ব্যবহারকে যদি সমস্যা হিসাবে ধরেন, তা হ'লে মনে হবে যে সবই বিরুদ্ধভাবে সাজান রয়েছে—সমস্যা তা না হ'লে হয় না। কিন্তু তাই ব'লে সত্য সত্যই ব্যবহারের মধ্যে বিরোধ রয়েছে ধরেন কি ক'রে? বিরোধ রয়েছে আপনার বুদ্ধিতে। বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু বুদ্ধি একত্রে ও একসূত্রে সব ব্যবহারকে যে সাজাতে পারছে না নিজেই অনুভব করছেন—যেটা বাদ পড়ছে তাকে সাজান'র

অন্তরায় ভাবছেন। অবশ্য এ কথা একশ' বার মানি যে এই উপায়েই বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় এবং তার ফলে মিলন-মন্ত্রের দর্শন লাভ হয়।

আমি—আপনারা কি ব'লতে চান যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটি কারুর কাছে সমস্যা আর কারুর কাছে নয়? তা হ'লে দাঁড়ায় এই যে, যার কাছে সমস্যা তার কাছে অর্থাৎ বুদ্ধিমানের কাছেই সম্বন্ধটি বিরোধের।

তাঁহারা—না, তা বলছি না, আত্মাভিমানে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছি। আমরা বলি—বুদ্ধিমান হ'য়েও পুরুষ স্বামী হিসেবে সুখী হ'তে পারে, এবং স্ত্রী বুদ্ধিমতী হ'য়েও নিজে সুখী হ'তে পারে এবং স্বামীকে সুখী ক'রতে পারে।

আমি—তা যদি বলেন, তা হ'লে সাফ্ কথা কইতে হয়। আমি এমন কোন বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী পুরুষ ও স্ত্রী দেখিনি যারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সম্পূর্ণ সুখী হ'য়ে দিন গুজরান্ ক'রছে।

তাঁহারা—আমরা এমন কোন নির্ব্বোধকে দেখিনি যে মজাসে দিন কাটিয়ে গেল। সংসার দুঃখময়।

আমি—খৃষ্টান কে?

তাঁহারা—সংসারে সুখ দুঃখ থাকবেই থাকবে। তবে মাত্রা নিয়ে কথা, কারুর ভাগ্যে সুখ বেশী, কারুর ভাগ্যে দুঃখ বেশী।

আমি—মানে হয় না ও কথার। কথাটার তখনই মানে হয় যখন সুখদুঃখকে মানুষের সম্পর্কে আনা হয়। কি দিয়ে সুখ-দুঃখকে মাপ্‌বেন? মাপার যন্ত্র না থাকার দরুণ নিজের ওপর ঘাত-প্রতিঘাত দিয়েই সুখ-দুঃখ ওজন ক'রতে হয়, নিজের বিচার-শক্তি অর্থাৎ সূক্ষ্মদৃষ্টিকেই বিশ্বাস ক'রতে হয়। আমার নিজের উপর আঘাতটাই নিজের কাছে বড়, আমার সুখদুঃখের বেলা

আমার বিচার-শক্তিই প্রধান, আমার আপদ-বিপদে, আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আমার দৃষ্টিই সূক্ষ্মতর।

তাঁহারা—নিশ্চয়ই! আজ তা হ'লে গ্রামোফোনের রেকর্ড শোনান। তর্ক আর চলে না।

আমি—তর্ক না চলুক, কথাবার্ত্তা চ'লতে পারে।

তাঁহারা—তাও হয় না। শুধু দীক্ষা হ'তে পারে—আমরা দীক্ষিত হ'তে আসিনি।

আমি—গুরু একের বেশী হয় না বুঝি?

তাঁহারা—ধর্ম্মে বাধে।

আমি—ঠিক্ কথা। আচ্ছা তর্ক ছেড়ে দিন! সত্যই কি আপনারা এমন স্বামী দেখেছেন যে স্ত্রীকে নিয়ে খুব সুখী, অথচ মানুষ হিসাবে বুদ্ধিমান?

তাঁহারা—দেখেছি কি দেখিনি বলতে চাই না। তবে অসম্ভব নয় বলতে পারি।

আমি—তা শুনব না। ব'লতেই হবে।

তাঁহারা—দেখেছি।

আমি—আরসি নিয়ে?

তাঁহারা—আত্মজীবনি ব'লতে আসিনি।

আমি—ছিঃ! আমিও শুনতে চাই না! আমিও ব'লছি না। আপনাদের হ'ল কি? দয়া ক'রে বলুন না—আমি একজনকেও দেখিনি। যে সত্য কথা কয়, অন্তত সত্য আচরণ করে, সেই বলেছে কিংবা ভাবগতিকে প্রকাশ করেছে যে, সে অসুখী।

তাঁহারা—আপনার মতে এর কারণ কি?

আমি—কারণ কি একটা! গোটা কয়েক বাইরের—গোটা কয়েক একেবারে ভিতরের! আবার বাইরের কারণকে সময়

সময় ভেতরের মনে হয়। সেদিন ক্লাসে Family-র ইতিহাস বলছিলাম, ছেলেরা প্রশ্ন ক'রলে, ভবিষ্যৎ কি বলুন। আমি উত্তর দিলাম, 'আমি astrologer নই, ভবিষ্যৎ কালের কোলে নয়, তোমরা যা ক'রবে তাই হবে, তোমরা কি ক'রবে আমি কি জানব?' একটি ছেলে বল্লে 'আমাদের হাত-পা বাঁধা, বাপ-মায়ের কৃপায় আমরা কিছুই ক'রতে পারি না'। ঠোঁটের ডগায় উত্তর এল, তবে বেঁধে মার খাও! ছাত্রের দল সাধারণত মিথ্যা কথা কয় না। তারা বাপ-মাএর দোষ দেয়। অর্থাৎ সমাজেরই অনেকটা দোষ।

তাঁহারা—বেচারা সমাজ! আজ কত বৎসর ধরে এই সমাজ কত দোষই না বহন ক'রে আসছে!

আমি—সেই জন্য সমাজের প্রতি আমার যে কৃপা হয় না তা নয়। অবশ্য দোষ শুধু সমাজের নয়। সমাজের দোষের জন্য মানুষই দায়ী। সে দোষ খণ্ডনের জন্য সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। আমাদের সমাজের মধ্যে শক্তিকেন্দ্র তৈরী হচ্ছে না। সব সমাজেই দোষ আছে, কিন্তু অন্য সমাজে এমন সব শক্তিকেন্দ্র, power-house আছে, যেখান থেকে শক্তি অর্জ্জন ক'রে যুবক-যুবতীর দল সমাজকে সচল ক'রে তোলে। আমাদের সমাজের ভেতরে ও ধরণের কেন্দ্র আর নেই। কেন্দ্র ব'ল্লে কোন অনুষ্ঠান বুঝবেন না। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই এ দেশে! শক্তির nucleus অশরীরিও হ'তে পারে, এবং তাই হ'লেই ভাল। Tradition ব'লতেও ভয় হয়, কোকিলের মত wandering voice গোছের। আমাদের দেশে যদি কিছু ক'রতে চান তা হ'লে বিপ্লবের সাহায্য নিতে হবে! তার কুফল সুফল দুইই আছে—কোন

ফল ফল্‌বে, আগে থাকতে বলা যায় না—কেননা সুফল ফলাবার জন্য একসঙ্গে শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান লোকের দরকার। সেটি দুর্লভ। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বুদ্ধিমান, কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁরা অপদার্থ—আর কংগ্রেসের নেতারা শক্তিশালী, কিন্তু বুদ্ধির ধার তাঁরা ধারেন না। আর আশ্রমের দোষ এই যে সেখানে গেলে অন্তত লজ্জার খাতিরে তার থেকে আর বেরোনো যায় না। অতএব সমাজ অচলায়তনই র'য়ে যায়, যতক্ষণ না state কিছু করে। আমাদের আবার state কোথায়? আমাদের আছে গভর্ণমেণ্ট, তাও নয়, আছে administration, তাও শান্তিরক্ষার জন্য, অর্থাৎ যা ছিল তারই রক্ষার জন্য, আর অর্থশোষণের জন্য। Administration-এর খেয়ে দেয়ে কি কাজ নেই যে সমাজকে ভদ্রলোকের বাসোপযোগী ক'রে তুলবে? তার স্বার্থ কি? এক যদি যুগধর্ম্ম বলেন, তা হ'লে নাচার। কেননা ও বস্তুটি কখনও আপনার আমার ধর্ম্ম নিয়ে তৈরী নয়, আর আপনার আমার ধর্ম্ম যেকালে আচার পালন ছাড়া অন্য কিছু নয়, তখন যুগধর্ম্মের অপেক্ষায় বসে থাকলে চিরকালই বসে থাকতে হবে। অতএব বেঁধে মার খাওয়াই ভাল নয় কি? ওতে একটা ভারী আত্মতৃপ্তি আসে—সেটি ত্যাগের। উপনিষদের উক্তিও আওড়ান যায়। অর্থাৎ সুখ ত্যাগ করাই যদি ভোগের চরম কথা হয়, তা হ'লে সব গোলমালই মিটে গেল!

তাঁহারা—এই বার আপনাদের গলদ্‌ কোথায় বুঝেছি। সুখী হ'তে গেলে ত্যাগ ক'রতেই হয়, এবং আপনারা তাতে রাজী নন্‌। অতএব আপনাদের সমস্যা খুব উঁচু ধরণের নয়। সমস্যাটি হচ্ছে—স্বার্থপর ব্যক্তির স্বার্থপরতার সঙ্গে অন্যকে জোর করে খাপ খাওয়ান!

আমি—অন্যকে ঠিক নয়, অন্যের স্বার্থকে। কিন্তু স্বার্থের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে। আমার বিশ্বাস আমার স্বার্থ অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা অনেক মূল্যবান। তবে সে স্বার্থটুকু সার্থক করবার জন্য অন্যের আবশ্যক। অন্যে রাজী হচ্ছে না, কেননা অন্যের কাজই হচ্ছে বাধা দেওয়া। বিশেষত, সে যদি ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন গঠনের, ভিন্ন ধরণের হয়, তা হ'লে বিপদ আরো বাড়ে।

তাঁহারা—আচ্ছা একটু অন্যভাবেই দেখুন না! যদি স্ত্রী বলেন যে, তিনিও মানুষ—এবং তাঁর প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের পথে আপনিই বাধা দিচ্ছেন।

আমি—তা হ'লে ব্যাপার অনেকটা সোজা হ'য়ে যায়। অর্থাৎ ইব্‌সেন ও তাঁর চেলাদের নাটক নভেলের শেষ পাতা খুলে সমস্যার নিরাকরণ করা যায়। ব্যাপার কিন্তু অত সোজা নয়। ওঁদের আপত্তি একেবারে জড়ের আপত্তি—যেখানে আপত্তি মুখর, সেখানে বুলিগুলি ধরতাই ও ধার করা। শেকড়ে শেকড়ে কি রকম লড়াই হয় জানেন ত? এ খানিকটা সেই ধরণের। আমার ধারণা হয়েছে যে স্ত্রীর একমাত্র কাজ স্বামীকে ঐ-ভাবে slowly strangle করা।

তাঁহারা—ছিঃ, আপনার গলায় দড়ি!

আমি—লজ্জা দেবেন না, দড়ি ছিঁড়ে যাবে আমার কপালে!

তাঁহারা—আপনি হচ্ছেন 'অসম্ভব' লোক।

আমি—অসাধারণ বল্লে কি মুখে ছাই প'ড়ত?

তাঁহারা—কেবল নিজের দিকে চেয়ে যে কথা কয়, কাজ ক'রে তারই কপালে অশান্তি।

আমি—সেকি, 'সোঽহং' মন্ত্রের কথা ভুলে গেলেন?

তাঁহারা—সে 'অহং' আর আপনার অহঙ্কার এক নয়।

আমি—আর আমি যদি বলি, অহঙ্কারের ভিত্তি খুঁড়তেই গেলেই তার ওপরের 'অহং'এর ইমারৎ ভেঙ্গে পড়বে, তা হ'লে দাঁড়াবেন কোথায়?

তাঁহারা—ভিত্তি খুঁড়তে খুঁড়তে দেখবেন সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য উবে গিয়েছে।

আমি—আমি অহঙ্কার সহজে ত্যাগ করতে পারব না।

তাঁহারা—বেশ, বাইরের কোন বড় কাজ গ্রহণ করুন! দু'জনে মিলে এক কাজ ক'রলে শান্তি পাওয়া যায়।

আমি—কাজ বাইরের হয় না, যদি হয়, তা হ'লে তাকে সাদরে গ্রহণ করা যায় না, যদিও বা নিজে করা যায়, পরকে গ্রহণ করান যায় না। যদিও তা করান যায়, তাতে শান্তি আসে না।

তাঁহারা—তা হ'লে যোগ নিন্।

আমি—যদি স্ত্রীরা রাজী না হন?

তাঁহারা—তা হ'লে বেঁধে মার খান!

আমি—কোন উপায় নেই? শান্তি উপভোগ করবার শক্তি বোধ হয় glands-এর ওপর নির্ভর করে।

তাঁহারা—অন্তত একটার ওপর!

আমি—আবার ফ্রয়েড্! খানিকটা সত্যি, বাকীটা?

তাঁহারা—মোদ্দা কথা, কারুর বিবাহ করা উচিৎ, কারুর নয়।

আমি—আশা করি, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কাউকে বাদ দিচ্ছেন না?

তাঁহারা—না, তা বলছি না, মেয়েরা সকলেই বিবাহ করবার জন্য প্রস্তুত।

আমি—বিবাহিত হ'বার জন্য যদি বলতেন, তা হ'লে সায় দিতাম। আপনাদের কথাই ঠিক্। আমারও বিশ্বাস, সকলে স্ত্রী হ'বার যোগ্য নয়, যেমন সব পুরুষ স্বামী হ'বার যোগ্য নয়। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক্। ছেলেদেরই ভাল স্বাস্থ্য খোঁজে মেয়ের বাপেরা এবং সমাজ-সংস্কারকেরা। স্বাস্থ্যের জন্য কর্ত্তাদের ব্যগ্রতার কারণ খুঁজলে দেখবেন যে, সমাজ-সংস্কারকদের সন্তানদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যাই বেশী, এবং মেয়ের বাপেরা নিতান্ত sentimental লোক। এই যে মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁদের sentimentality—তাতে যে দেশের কত ক্ষতি হচ্ছে তা তাঁরা জানেন না। অনুগ্রহ ক'রে যদি তাঁরা সংস্কার-কার্য্য ও কন্যা উৎপাদন কার্য্য থেকে বিরত হন, তা হ'লে দেশের জন্য কিছু চেষ্টা ক'রে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা বড় ধার্ম্মিক ও দীর্ঘজীবি।

তাঁহারা—মেয়েদের কি পরীক্ষা ক'রে নিতে চান?

আমি—হাঁ।

তাঁহারা—কে করবে? কি ভাবে হবে?

আমি—যখন শ্বশুর ভাল জামাই চান্, তখন কি হাতে পরীক্ষার প্রশ্নলিপি থাকে? তা থাকেনা, আর থাকলেই যে পরীক্ষার ফল ভাল হ'ত তা নয়। এর মধ্যে দামী কথা এই যে আজকালের শ্বশুররা মেয়েকে যার-তার হাতে সঁপে না দিয়ে অপেক্ষা ক'রতে পারেন—শুধু first class দেখেই ক্ষান্ত হন না, যাচিয়ে নেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের মেয়েদের যাচাতে দেন না, তাঁদের bourgeois sense of respectability-তে বাধে। ছেলের বাপেরাও লোভী ও সৌন্দর্য্যের উপাসক—রং ফরসা, দেখতে ভাল, ইংরেজী জানে, গান জানে, সেলাই জানে, তার

ওপর বড়লোকের মেয়ে হ'লে ত' ব্যস্! তা সে যত রোগের কুটিই হোক্ না, ইংরেজীতে তার যত বানান্ ভুলই থাক্ না কেন, গান যত বেসুরোই গাক্ না কেন, যত ঝগড়াটেই হোক্ না কেন! কিছুতেই আসে যায় না—কেননা মেয়ের স্বভাবটি ছেলের কপাল! আমার সব চেয়ে রাগ হয় এই ধরণের sentimentality-র ওপর। আজকালকার বাপেরা মেয়ের প্রতি নজর দিচ্ছেন, লেখা পড়া গান বাজনা শেখাচ্ছেন। তাকে শিক্ষা বলা যায় না, সে বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যার চেয়েও নিম্নস্তরের! খানিকটা শিখিয়ে তাঁরা মেয়েকে জামাই-বাড়ী ছেড়ে দিলেন—চ'রে খাক্ গে—তাঁদের কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হ'ল, তা সে ঘুঘুই চরাক্ আর গরুই চরাক্! মাঝে মাঝে, 'বাবা তোমার জন্য মন কেমন ক'রছে' লিখলেই হ'ল! একবার যদি শ্বশুরেরা নেপথ্য হ'তে দেখতে পেতেন যে, তাঁদের আদুরী কন্যার দল স্বামীর ঘরে গিয়ে কি করেন, তাঁদের অস্তিত্ব, তাঁদের প্রেম, তাঁদের সতীত্ব, তাঁদের স্ত্রীত্ব, স্নেহ, মমতা দিয়ে, কি মধুর ভাবে, ময়ালসাপের মতন গেলবার আগে স্বামী-হরিণের গায়ে লালা ঢালেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা আঁৎকে উঠ্তেন! কিন্তু তাঁদের দেখান অসম্ভব, কেননা তাঁরা অন্ধ, স্নেহে ও দাম্ভিকতায়। তাঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না। বাপ-মাকে ঠকান মেয়েদের পক্ষে নিতান্ত সহজ কাজ। তাঁরা ঠকুন্ যত পারেন তাতে আপত্তি নেই, আপত্তি হচ্ছে আরো ভয়ঙ্কর।

তাঁহারা—এর চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর কিছু আছে না কি?

আমি—আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, পিতৃভক্ত কন্যা কখনও স্ত্রী হবার উপযুক্ত নয়। এই কথা প্রত্যেক স্বামী জানে—কোন পিতাই জানেন না। তা হ'লে সমাজের দিক থেকে

দোষ হ'ল, কন্যার প্রতি প্রত্যেক পিতার ও মাতার sentimental attitude। একটা উপদেশ দিতে পারি—যদি আপনারা আপনাদের ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে যান, তা হ'লে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'মা, তুমি তোমার বাবাকে ও কাকাকে কি ব'লে ডাক'? যদি উত্তর পান, তুমি—তখনই ছাঁচিপান না খেয়েই পালিয়ে আসবেন—এক মুহূর্ত্ত ব'সবেন না সেখানে।

তাঁহারা—আরো দু'-চারটা প্রশ্ন তৈরী ক'রে দিতে পারেন? দেশের ও দশের মঙ্গল হয়।

আমি—প্রশ্ন তৈরী করার জন্য Expert committee বসান দরকার। সভাপতি Experimental Psychology-র কোন বিজ্ঞ অধ্যাপক—অন্যান্য সভ্য, গিরীন্দ্রশেখর, Berkley-Hill কিংবা কোন বাঙ্গালী alienist, একজন Eugenist, একজন Gland-expert, and the hon'ble mover। পরীক্ষার জন্য আজকাল প্রশ্নকারকেরই খাটুনী বেশী, পরীক্ষার্থীর কাজ দশ মিনিটে ক্ষান্ত। আর তার বেশী কিছু করাও যায় না।

তাঁহারা—পরীক্ষা ত' হ'ল, পরীক্ষোত্তীর্ণার সঙ্গে প্রেম হবে কি ক'রে জানবেন?

আমি—একেবারেই হবে না। ঠিক সেই জন্যই তাকে বিবাহোপযোগ্যা বিবেচনা করি।

তাঁহারা—তা হ'লে প্রেমটা—

আমি—হাঁ, ঠিক্ তাই হ'লে সর্ব্বনাশ! গল্‌তি ঐখানে। সব ছেলেরা গোড়ায় গোড়ায় বৌএদের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যায়। নিজেকে ধরা দেয় ব'লতে চাই না—কেননা এদেশে যখন বিবাহ হয়, তখন নিজ ব'লতে নিজের দুর্ব্বলতা ও ভাবপ্রবণতাই বোঝায়। যখন দুর্ব্বলতা ঝরে যায়, তখনই বিবাহ করা

উচিৎ—তুই পক্ষের। তবে মেয়েদের sentimentality বোধ হয় কখনও যায় না, সেই জন্য স্বামীর চরিত্র এমন classically composed হওয়া চাই যে মেয়েরা তার 'বন্দেশ্'কে কিছুতেই, কোন ছলনার দ্বারাই ভাঙ্গতে সক্ষম হবে না। স্ত্রীরা সব যুযুৎসু জানেন, তুর্ব্বল কি না, তাই শিখ্‌তে হয়েছে। আমাদের ও কাটান্ প্যাঁচ, মারণ-মন্ত্র শিখ্‌তে হবে।

তাঁহারা—প্রেমে পড়া তা হ'লে পাপ!

আমি—দেখুন, 'তা হ'লে', 'তা হ'লে' করবেন না। প্রেমে পড়া পাপ কিনা জানি না—তবে স্ত্রীর সঙ্গে গোড়া থেকেই প্রেমে পড়লে একটা ভীষণ দোষ হয় এই যে, স্ত্রীকে ভিন্ন না ভাবে অন্তত সমান সমান ভাবতে হয়। মেয়েরা যে আলাদা জীব, এবং সমান নয়, এই না ভেবে জীবন-যাত্রা স্বুরু ক'রলেই সর্ব্বনাশ হয় দেখেছি। প্রকৃতিকে এক ছাঁচে ঢাল্‌লে সে প্রতিশোধ নেবেই। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই বিদেশী ধারণা of sex-equality পারিবারিক অসুখের একটি মূল কারণ! শুধু ধারণাটি ধারণ ক'রলে আপত্তি নেই, কিন্তু জীবনে তাকে প্রয়োগ ক'রতে গেলেই সমূহ বিপদ। ইংরেজী শিক্ষিতের মতন ভাবপ্রবণ ও ধরতাই বুলির দাস সমাজের আর কোন শ্রেণীতে আছে কি না জানিনা। ঐ ধরণের ধার করা বুলি খাটাতে গিয়ে সংসার ছারেখারে গেল! তবে এ কথা ঠিক যে, এই সংসার কি সমাজ ছারেখারে যাওয়াই উচিৎ। তার দরুণ অশান্তিটা আপনার আমার পক্ষে কষ্টদায়ক হ'লেও সমাজের উন্নতির পক্ষে ততটা নয়। তাতে অবশ্য সান্ত্বনা নেই।

তাঁহারা—আপনি যে ব'ল্লেন—বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই অসুখী হয়! এটা যে একেবারে উল্টো কথা মনে হচ্ছে!

আমি—আমাদের দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির মানে, বুদ্ধিজীবি। তবে তাদের বুদ্ধির মার্জ্জন-মর্দ্দন খানিকটা যাও হয়েছে, হৃদয়-বৃত্তির তাও হয় নি।

তাঁহারা—হৃদয়-বৃত্তির শিক্ষা হ'লে ত' লোকে আরো প্রেমে প'ড়বে! বিশেষত, আপনারা, কেননা, আপনাদের হৃদয় ক্ষুধিত!

আমি—তা নয়। আপনারা যাকে প্রেম বলেন, সেটা শিক্ষার দরুণ লোপ পায়। শিক্ষা ব'লতে আমি অভ্যাস বলি। বিবাহের পূর্ব্বে বার তিন-চার প্রেমে পড়লে খানিকটা শিক্ষালাভ হয়। একটু পোড়্ খেয়ে বিবাহ ক'রলে চরিত্রের দৃঢ়তা আসে, অর্থাৎ বুদ্ধির মেরুদণ্ড একটু শক্ত হয়। একধারে বিদেশী বুলির চাপ, অন্যধারে হৃদয়-বৃত্তিচর্চ্চার অসুবিধা—এই দুইএ মিলে আমাদের দেশের বুদ্ধিমান যুবক প্রথমেই স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খায়, তার পর যখন চোখ খোলে তখন দেখতে পায় যে জীবনটা বরবাদ্ হ'য়ে গিয়েছে। নতুন ক'রে প্রেমে পড়বার সুযোগ নেই, থাকলেও ধর্ম্মে বাধে—কেননা, স্ত্রী হ'লেন ধর্ম্মপত্নী। পুরুষদের বেলায় যদি একথা একগুণ সত্যি, মেয়েদের বেলায় হাজার গুণ! বুদ্ধিমান লোকে অসুখী হয় বলেছিলাম এই ভেবে যে, তাদের চোখ একবার না একবার খোলে! অন্য সম্প্রদায়ের চোখ কখনও খোলে না, এবং তাঁরাই সুখী, তাঁরাই সমাজের স্তম্ভস্বরূপ!

তাঁহারা—আচ্ছা, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতীরা সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা স্মরণ ক'রে একটু সুখী ত' হ'তে পারেন?

আমি—তাঁরাও মানুষ ভুলচেন কেন? মানুষ হ'লেই শান্তি ভালবাসতে হবে। আশা, ভবিষ্যতের আশা, মরে গেলে অনাগত বংশধরের উন্নতির আশা পোষণ ক'রে অশান্তিকে দৈনন্দিন জীবন

থেকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটু practical ভাবে দেখুন না! আপনাদের জীবনে শান্তি রইল না, কেবল মনোমালিন্যই রইল—এই আবহাওয়ার মধ্যে আপনাদের সন্তানাদি কি ক'রে সহজ ও সরলভাবে বেড়ে উঠবে? বাপ-মা'এর মধ্যে যদি ভাব না থাকে, তাদের জীবনের প্রত্যেক আচার-ব্যবহারে সহানুভূতি, সমবেদনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় যদি সন্তানে না পায়, তা হ'লে, বড় হ'লে, সন্তানরা যখন সামাজিক জীব হবে, তখন তাদের বুদ্ধিতে, প্রবৃত্তিতে সেই অশান্তির ফলে গোটা কয়েক সাংঘাতিক জট পাকান থাকবেই থাকবে। সে জট ছাড়ান কত শক্ত তা কী ব'লব! সমাজের মধ্যে যে হাজার কুৎসিত ব্যাপার ঘট্‌ছে তার গূঢ় কারণ ঐ। অতএব আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্য ও অশান্তি থাকার দরুণ আপনাদের বংশধরদের জীবনও নষ্ট হ'য়ে যায়। সেই জন্যই বলি, ভবিষ্যতের আশায় বসে থাক্‌লে চলে না। ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে আমাদেরই হাতে—অতএব আমাদের জট আমাদেরই ছাড়ান উচিৎ। অশান্তি হচ্ছে রক্তবীজের জাতভাই। যদি কেউ পরে কি হবে ভেবে নিজেকে সুখী ক'রতে চেষ্টা করে, সে করুক! আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু মনে হয়, তাতে বড় বেশী কাজ হয় না—সেটা rationalising ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তাঁহারা—আপনি ঠিক্ কি ব'লতে চান?

আমি—সেটা যদি এখনও বুঝতে না পেরে থাকেন তা হ'লে নাচার। আমার বক্তব্য সোজা, ভাষাও সাদাসিধে। মোদ্দা কথা এই যে, স্ত্রীজাতির প্রতি মোহ কাটাতে হবে। শক্ত কাজ।

তাঁহারা—একটা সোজা উপায় বলুন।

আমি—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মোহ কাটাতে হবে। এইটাই বিবাহের strategy, ফ্রয়েড শুধু tactician of marriage।

তাঁহারা—স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মোহ কাটাতেও বলেন?

আমি—তাঁরা ভিন্ন জাতি, তাঁদের কথা অন্য, বিবাহে তাঁদের যুদ্ধরীতি ভিন্ন, উদ্দেশ্য পৃথক্। তাঁদের কথা তাঁরা বলুন। অনুরোধ এই, সকলে, তাঁরা না পারেন, আপনারা একটু সত্য কথা বলুন—প্রাণ খুলে। ধার করা বুলি নয়, খাঁটি কথা, সাহিত্যের বুলি নয়, প্রাণের কথা, আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুলি নয়, সোজা সাফ্ কথা। মোহ কাটান চাই আমাদের, আমি এইটুকু জানি।

তাঁহারা—মোহ নিতান্তই স্বাভাবিক যে কালে, তখন কাটাবেন কি ক'রে? মোহ কাটালে আবার যদি জট পড়ে? যদি অপকার হয়? প্রকৃতি যদি প্রতিশোধ নেয়?

আমি—আপনাদের প্রশ্নে অনেক ফাঁকি রয়েছে। প্রবৃত্তি আর মোহ এক নয়, ম্যাক্‌ডুগাল্ সাহেব জুড়্‌তে গিয়ে বিপদে পড়েছেন। প্রবৃত্তিটাও সব সময়ে প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। তাও যদি হয়, তা হ'লে প্রকৃতি যে একটা কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে নীরবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, আপনার আমার জনান্তিকে কাজ ক'রে যাচ্ছে ভাব্‌বার কোন অর্থ নেই। বুদ্ধিটা অবশ্য মানুষের, প্রকৃতির নয়। আমার এই বিশ্বাস যদি সত্য হয়, তা হ'লে ব'লতে হ'বে যে, বুদ্ধির দ্বারা মোহ কাটান যায়; মোহকে জোর ক'রে দাবিয়ে হয়ত নয়। মোহের স্বভাবই হচ্ছে ধীরে ধীরে লোপ পাওয়া; সেই লোপ পাওয়ার পন্থাকে একটু ঢালু ক'রতে হবে, তার গতিকে দ্রুত ক'রতে হবে—তার স্বভাবকে জানতে হবে, তাকে একটু

canalise, একটু sublimate ক'রতে হবে। দুঃখের কথা যে, psycho-analysis এখনও biology, বিশেষ ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর biology-তে আটক্ রয়েছে। দেহ থেকে মনের আংশিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহ-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের হাত থেকেও মনোবিজ্ঞানের আংশিক মুক্তি প্রার্থনীয়। আপনাদের দোষ হয়েছে যে, আপনারা সেই ম্যাক্‌ডুগালের মতের দাস হয়েই রইলেন। সমগ্র স্ত্রী-জাতির প্রতি সমগ্র পুরুষজাতির attitude-কে যদি instinctive বলেন তা হ'লে আমার আপত্তি নেই।

তাঁহারা—কেন?

আমি—কারণ, সে attitude-টা instinct-এর মতনই abstract। সমগ্র পুরুষ-জাতি এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতি ব'লতে বুঝি একটা average পুরুষ, আর একটি average মেয়ে। যেই average পুরুষ ধ'রলাম, অমনি, সঙ্গে সঙ্গে, যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ছেঁটে ফেল্লাম, তাকে প্রতীক, প্রতিনিধি ও আদর্শ ঠিক করলাম। সেইখানেই ক্ষান্ত হ'লে তবু বিজ্ঞানের সুবিধা হ'ত—কিন্তু থাম' ব'ল্লেই মনের কাজ থামে না—তাই তার ভিতরে পুরলাম আমাদের আদরের বিশ্বাস-গুলোকে—ম্যাক্‌ডুগালের রচিত, খবরের কাগজ মারফৎ আমাদের পরিচিত মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে গোটাকয়েক গড়পড়তা ধারণাগুলিকে। কেউ ভেবে দেখলাম না যে, মানবপ্রকৃতি একটা homogeneous পদার্থ নয়, ও তার সম্বন্ধে ঐ ধরণের abstract generalisation করা যায় না—কেউ ভাবলুম না যে প্রতীকত্বে, প্রতিনিধিত্বে, ব্যক্তিগতসত্তা—বস্তুর একমাত্র সত্তা ঠাঁই পেল' না। এ রকমের জুয়াচুরী ক'রলে আর

কেন মনে হবে না যে, বুদ্ধির দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা প্রকৃতিকে বশ করা যায় না! প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনাদের কথা শুনলে আমার আদিম অসভ্যজাতির কথা মনে হয়। আর কি মনে হয় জানেন? জোর ক'রে behaviourism পড়াই। অনুগ্রহ ক'রে ভুল বুঝবেন না। প্রবৃত্তি নেই বলছি না, মোহ নেই বলছি না। অভ্যাসই সব। তবে বলি যে, অভ্যাস ভাঙ্গা যায়। অতএব যদি শান্তি চান তা হ'লে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অভ্যস্ত ও সংস্কারগত মনোভাবকে বদ্‌লাতে হবে—এবং তার সঙ্গে নতুন ব্যবহারের ও অভ্যাসের পত্তন ক'রতে হবে। ভরসা এইটুকু যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্ত্রীকে উর্ব্বশী হিসাবে দেখেন না, এবং প্রায় সকলেই মোহমুক্ত হব' হব' হ'য়ে আছেন—শুধু গোটাকয়েক censorship-এর ভয়ে মোহমুক্ত হ'তে পারছেন না। সত্যকারের শান্তিময় বিবাহিত জীবনে, অর্থাৎ rational basis of marriage-এ মোহের গন্ধ পর্য্যন্ত থাকে না।

তাঁহারা—যতটুকু বুঝলাম তাতে মনে হচ্ছে যে আপনি প্রত্যেক স্বামীকে rational হওয়া দূরে থাকুক, caveman হ'তেই উপদেশ দিচ্ছেন।

আমি—ছাই বুঝেছেন! সেখানেও মোহ ছিল। গুহার মধ্যে ভীষণ অন্ধকার, এবং অন্ধকারেই মোহ খোলে। আদিম মানবের মোহ ছিল না জান্‌লেন কি ক'রে? খুব গোড়ায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি ছিল জানা নেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই ছিল, কি ছিল না, তাই জোর ক'রে বলা যায় না। যাদের কথা জানি তারা ছিল শিকারী—বনের ও সমুদ্রের। তাদের মধ্যে মেয়েদের স্থান বেশ উঁচুতেই ছিল। যাযাবর অবস্থাতেও

তাদের স্থান বিশেষ কিছু নাবেনি। চাষ-বাস যখন পাকা হ'ল, তখন থেকে পুরুষদের আর বাড়ী ছেড়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবার তত প্রয়োজন রইল না। অল্প পরিসরের মধ্যে খাদ্য জুটে গেল, একেবারে বাড়ীর চারপাশে। চাষের কাজ ও পশুপালন বাড়ী ব'সেই চলে। পুরুষেরা বাড়ীর ঘাঁটি আগলাতে আরম্ভ ক'রলে, সেখানে তারা মাথা কাড়া দিতে সুরু ক'রলে। ঘরের কাজ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ভাগ হ'ল, মেয়েদের কাজ সঙ্কীর্ণ হ'তে লাগল, স্থানও ধীরে ধীরে নেমে গেল। তবে তাদের অন্য প্রয়োজন ক'মল না। সংসারের দৈনন্দিন কাজের খাতিরেই তাদের ছিল খাতির। গ্রামে বসবাস ক'রে, চাষবাসের দীর্ঘ-অবসরে, সকলে মিলে গৃহ-শিল্প ও সাহিত্য-চর্চ্চা সুরু ক'রলে। আমরা প্রায় এই সময় থেকেই মেয়েদের ঠকাতে সুরু ক'রলাম। তারা হ'ল তাঁরা। তাঁদেরকে বল্লাম, 'ওগো, তোমরা আমাদের ঘরণী, গৃহিণী, মা, বোন, প্রেয়সীর জাত, তোমাদের দায়িত্ব এখন কিছু কমেছে, অতএব ঘরকে তোমরা সুন্দর ক'রে তোলো'। ঐ হাড়ভাঙ্গা ছোট কাজের মধ্যে মিষ্ট কথা শুন্‌লে কার না মন ভেজে! এই মিষ্টি কথার রেশ্‌ চলল কয়েক হাজার বৎসর ধ'রে। তার পরে, জন কয়েক লোক গোটা কয়েক কলকজা আবিষ্কার ক'রলে। তারই ফলে সব গেল বদ্‌লে। কোথায় রইল বন্যজন্তু শীকার, কোথায় রইল ছ'মাস সমুদ্রের বুকে ভাসা, কোথায় রইল গোচারণ, অশ্বপালন, কোথায় রইল মাটি আঁচড়ান ও কোদ্‌লান, কোথায় রইল আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকা, কোথায় রইল জমীদারের কৃপায় জীবন-যাপন? সব গেল বদ্‌লে, উল্‌টে-পাল্‌টে। জীবন-যাত্রার ভীষণতা, অনিশ্চিততা, আপদ বিপদ সব গেল কমে। অন্তত সকলের এই মনে হ'ল। আরে তাই কি হবার জো আছে!

কোথা থেকে শকুনির ঝাঁক ঝেঁপে পড়ল! গ্রাম ও জমি থেকে সব বিতাড়িত হ'য়ে স্ত্রী-পুরুষে সহরে এল, কারখানায় রোজগার ক'রতে। টাকা চাই, কর্ত্তার মাইনে কম। শিশু ও শিশুর মা'রা পর্য্যন্ত রোজগার আরম্ভ ক'রে দিলে। মেয়েদের প্রয়োজনীয়তা পুরুষে এতই উপলব্ধি ক'রলে যে, স্বামীর দল legislative protection of woman labour-এ আপত্তি পর্য্যন্ত ক'রতে ছাড়েনি! প্রয়োজনীয়তা বাড়ার সঙ্গে মেয়েদের খাতির বাড়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তা হ'ল না। ঘরের বিস্বাদে ও pin-money-র মোহে মেয়েরা তখন মুহ্যমান। তাও ঠিক্ নয়। সব কাঁচিয়ে দিলে ঐ কারখানার আবহাওয়া। ঐ হাড়ভাঙ্গা কাজ মন দিলে ভেঙ্গে। দিনের ভেতর বারো-চোদ্দ ঘণ্টা খাট্‌লে, পুরুষ মানুষে মদের দোকানে ও কুস্থানেই ছুটবে—মেয়েরাও বাড়ী এসে সুখী হবে না, এই স্বাভাবিক। বাড়ীতেও মেয়েদের কাজের বিরাম নেই—রান্না-বান্না, ছেলে-পিলে মানুষ করা ত' রয়েইছে। আর কি এক-আধটা ছেলে-পিলে! এ সময়ের, এমন কি এখনকারের differential birth-rate ও death-rate দেখলেই বুঝবেন! যার কাজ যত বেশী তার ওপরই ষষ্ঠী ঠাক্‌রুণের তত কৃপা। লক্ষ্মী ও ষষ্ঠী ঠাকরুণের শত্রুতা চিরন্তন। মেয়েদের অবস্থা মধ্যযুগের দাসীর চেয়েও খারাপ হ'ল। তারা বেঁকে দাঁড়াল। দাঁড়াবেই না বা কেন? বড়লোকের মেয়েরা মোটর চড়ে বেড়াবে—আর তারা বইবে ছেলে, ঠেল্‌বে কয়লাগাড়ী, আর পাকাবে সুতো? ম্যাডাম বোভারি সমাজের সব শ্রেণীতেই আছে! যতদিন ভিক্টোরিয়ার জয় জয়কার ছিল ততদিন বেশী কিছু হয়নি। এমন সময় প্রকাশিত হ'ল Fruits of Philosophy, এই পঞ্চাশ বৎসর

আগে। পুরুষরা দেখলেন—সব শ্রেণীর মেয়েরাই লেখা পড়া শিখছে, দেরীতে বিবাহ ক'রছে, সুবিধা পেয়ে কৃতিত্ব দেখাচ্ছে, সব ধারেই ঘর ভাঙ্গতে আরম্ভ হয়েছে। অমনি আমরা আর একটি মন্ত্র ঝাড়লাম—'ওগো, তোমরা বাইরে এসেছ ভালই করেছ, তবুও তোমরা অবলা, মনে নয়, আত্মায় নয়, দেহে। তোমরা তেলাপোকা গির্‌গিটি দেখলে এখনও অজ্ঞান হও, তোমরা ঐ রকম পোষাক পরে ছুটতে পার না, তোমাদের কথায় কথায় মাথা ধরে। কিন্তু তাতে দুঃখিত হও কেন? তোমরা আমাদের চেয়ে স্নেহে, মমতায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে, অর্থাৎ হৃদয়-বৃত্তিতে অনেক বড়। দু'এক বিষয়ে ছোট হ'তে পার—কিন্তু never mind —গড়পড়তায় তোমরা আমাদের সমান—কেননা তোমাদেরও মন আছে, আত্মা আছে। মধ্যযুগের chivalry মিশ্‌ল age of reason-এর equality-র সঙ্গে। রাজযোটক মিল হ'ল! মেয়েদেরও ছিল inferiority-complex, তারই বশে তাঁরা এতদিন চেঁচাচ্ছিলেন। তাঁরাও বল্লেন, 'নিশ্চয়ই আমরা সমান, সমান শুধু নয়, একেবারে এক'। আমাদের মিথ্যাদান তাঁদের রুদ্ধ আকাঙ্খার সঙ্গে মিলে গেল। ফলে আমাদের বশীকরণ মন্ত্র হ'য়ে গেল natural law of equality! কেউ দেখলে না কোথায় ফাঁকি রয়ে গেল! কেউ এই নব আবিষ্কৃত natural law-এর সঙ্গে সেই পুরাতন natural law of fundamental difference খাপ্‌ খাওয়ালে না!

তাঁহারা—এ ত' গেল বিদেশের কথা। আপনার এক মস্ত দোষ যে, সভ্যতা বলতে য়ূরোপের সভ্যতাই বোঝেন।

আমি—না, তা বুঝি না। বৈজ্ঞানিক হিসেবে দেখতে গেলে, objectively বুঝতে গেলে, আমরা এখনও য়ূরোপের মধ্য-

যুগের অর্থাৎ mid-Victorian যুগের লোক। তাও নয়, agricultural stage আমরা ছাড়িনি। ছাড়লেই বা কি হ'ত! এ দেশের আবার নতুন ইতিহাস আছে নাকি? আমাদের সবই ত' ধার করা! য়ুরোপে যা হয়েছিল, আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য এখানেও তাই হবে—না হ'লে মনে হবে কিছুই হ'ল না। আমি আদিম অবস্থাতেও যেতে চাই না, য়ুরোপের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোক্ তাও চাই না। আদিম অবস্থায় ফিরে যাওয়া যাবে না; ও বিদেশী সভ্যতার ইতিহাসে যা' ঘটেছে তাই এদেশে ঘটুক, কেননা যা' হয়েছে, তাই ভাল হয়েছে, এ রকম আশা ও বিশ্বাস পোষণ ক'রতে নারাজ। আমি জুয়াচুরী বরদাস্ত ক'রতে পারি না। দেখ্‌ছি, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে একটা জুয়াচুরী র'য়েছে। জুয়াচুরীটা খুব পুরাতন, ঐতিহাসিক ও শাশ্বত ব'লতে পারেন। সনাতন-প্রথা এবং ইতিহাসই জুয়াচুরীকে মোহতে পরিণত ক'রতে পারে। ঐতিহাসিক জুয়াচুরীর গোষ্ঠী-সংস্করণের নামই স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ সম্বন্ধ, ও তার ব্যক্তিগত-সংস্করণের নামই প্রেম ও মোহ—প্রেম কি মোহের মধ্যে প্রকৃতিদেবীর কারচুপী নেই।

তাঁহারা—সভ্যতা খানিকটা কৃত্রিম হবেই হবে—সভ্যতার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি, খানিকটা খাদ্ থাক্‌বেই থাকবে। আপনি দেখ্‌ছি মানুষকে perfect না ক'রে ছাড়বেন না!

আমি—বুদ্ধির লক্ষণই তাই। Age of reason-এর প্রধান কথা তাই ছিল—perfectibility of human nature-এ প্রগাঢ় বিশ্বাস। বুদ্ধিবাদীরা, encyclopædist-রা বিপ্লববাদী হ'তে পারেন, বুদ্ধির সাহায্যে, reason দিয়ে মানুষে দেবতা হ'তে পারে, এই বিশ্বাসের দিক্ থেকে।

বুদ্ধিকে বাদ্ দিয়ে রুশো, টলষ্টয়, থোরো, গান্ধির মতন বিপ্লববাদী হওয়া যায়, কিন্তু আমাদের আদর্শ ভল্‌টেয়ার, ডিডেরো, রাসেলের। তা ছাড়া আরো দেখুন, সভ্যতার মধ্যে খাদ্ না হয় রইল, কিন্তু ভদ্রতার মধ্যে খাদ্ থাকলে চলে না। জার্ম্মাণ পণ্ডিত যাই বলুন না কেন, ভদ্রতা না হ'লে সভ্যতা হয় না। ভারতবাসী সভ্যতা ও ভদ্রতাকে দু'ভাগে বিভক্ত ক'রতে পারে না। ভদ্রতার মধ্যে জুয়াচুরী কপটতা থাকবে না। সেই জন্যই বল্‌ছি, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে মোহ কাটান্, তবেই স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ সহজ, সরল ও সুন্দর হবে। বিদেশী বুলির মোহ কাটান ভারী দরকার!

তাঁহারা—তা হ'লে দাঁড়াল এই ...

আমি—বাড়ী গিয়ে ভাব্‌বেন ও নোট লিখ্‌বেন।

তাঁহারা—নোটে কাজ নেই। ফল কি হবে ভেবেছেন?

আমি—মা ফলেষু কদাচন। একেবারে নিষ্কাম কাম! জেলে যাওয়া আমার কাজ নয়, আমার কাজ বীজ ছড়ান।

তাঁহারা—পুরুষেরই কাজ! বীজ না বিষ?

আমি—যা' ভাবেন!

তাঁহারা—একটা practical suggestion দিন্ না?

আমি—To summarise, gentlemen—মেয়েদের পিতারা বিবাহের পূর্ব্বে ছেলে-মেয়েকে সমান ভেবে কিংবা 'ক'দিন আর আমার ঘরে থাকবি' ভেবে, অর্থাৎ করুণাপরবশ হ'য়ে উচ্ছন্ন না দিয়ে, মেয়েদেরকে পৃথক ভেবে, ভিন্ন শিক্ষা এবং অন্য ঘরের উপযুক্ত হওয়ার শিক্ষা যেন দেন্। এই হ'ল first point—। My second point which follows from the first, as night follows the day......

তাঁহারা—অপমান ক'রবেন না! আজ এই পর্য্যন্ত। বাড়ী গিয়ে একটু মোহযুক্ত হইগে।

আমি—নিজেরা উচ্ছন্ন গেলে আমি আর কি ক'রব! আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রলাম—তার পর—তার পর—তার পর যা' ইচ্ছা তাই করুন! নমস্কার! তবে, ডি, এল্, রায়ের নায়কেরা যেমন বলেন, যাবার সময় এক কথা ব'লে যাই,—মনে রাখবেন, হৈমন্তী গল্পের আর একটা দিক্ আছে, কুমুর সম্বন্ধে মধুসূদনের কথাও বিপ্রদাসকে শুন্‌তে হবে। শুধু বাপের, কি দাদার, কি মেয়ের আর্‌জীর ওপর এক তর্‌ফা ডিক্রী দেওয়া আইন সঙ্গত নয়। আপনারা দেশভক্ত, ও কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের পোকা, তাই আপনাদের অন্তত লয়েন্সের বদলে শরৎ চাটুয্যের সতী গল্পটা প'ড়তে অনুরোধ ক'রছি।

তাঁহারা—ঐ ক'রেই আপনার সর্ব্বনাশ হ'ল! আমরা পালাই! শুধুই ঠাট্টা, গম্ভীর কথাতেও ইযার্‌কী!

আমি—তবে ইয়ার্‌কীর বেলা গম্ভীর নই, এইখানেই দল থেকে তফাৎ! কবে আসছেন?

তাঁহারা—আর কখ্‌খনো নয়!

আমি—তাই কি হয়! নিজেকে অ-সাধারণ ভাব্‌ব কি দিয়ে?